বাংলা সাহিত্যের খসড়া

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

দি বুক এম্পোরিঅম লিমিটেড

প্রকাশক—
শ্রীপ্রসাদকুমার সিংহ
দি বুক এমপোরিঅম লিমিটেড্
২২।১, কর্নওঅলিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর—
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সিংহ
দি প্রিন্টিং হাউস
২০, কালিদাস সিংহ লেন
কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় সংস্করণ
ভাদ্র, ১৩৫৮
মূল্য ২৲ টাকা

বাংলা সাহিত্যের খসড়া

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকে ইতিহাস প্রণয়ন করে কীর্তি-মন্দিরের পথ রচনা করে গেছেন। তাঁদের পদানুসরণ করে অগ্রসর হওয়া আপাততঃ আমার দুরাকাঙ্ক্ষার নাগালের বাইরে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কথা মনে করে আমি বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাদের কিছু আভাস দেওয়ার জন্য সামান্য একখানি পুস্তক ইতিপূর্বে রচনা করেছিলাম ; সম্ভবতঃ অভ্যাসের বশেই এবার আর একটু দূর এগিয়েছি—সাধারণ পাঠক, যিনি বিদ্যালয়ের ছাত্র নন, কিন্তু আমাদের সাহিত্যের ইতিকথা স্বল্প পরিসরের মধ্যে স্বল্পায়তনে জানতে চান, তাঁর জন্যই এই বই লেখা হল। ভরসা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের নব দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে ও সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সম্বন্ধে ব্যাপক কৌতূহল নিকট ভবিষ্যতে সম্ভব হবে, এবং এই বইখানিরও পাঠকের অভাব ঘটবে না।

বইখানি সপ্তকাণ্ড হলেও এর প্রথম দুই কাণ্ডে সাহিত্য ও সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে খানিকটা আলোচনা করেছি। এতে 'এ

আবার কী কাণ্ড!' মনে করার কথা নয়। কারণ, প্রথম পরিচয়ের পরে সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণ ধারণাগুলো আলোচনার দ্বারা একটু পরিষ্কার করে নেওয়ার খুবই প্রয়োজন, আর সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বাংলার গূঢ় সম্বন্ধের কথা স্পষ্ট করে বলাও একবার দরকার। অবশ্য এজন্য বাংলা সাহিত্যের আলোচনার আয়তন আরও কমে গেল। তবে আশা করি, যেখানে যেটুকুর অভাব ঘটেছে, বিচক্ষণ পাঠক সেটুকু তখনি মিটিয়ে নেবেন।

যতই বর্তমান যুগের কাছে এগিয়ে এসেছি, ততই বিষয়-বস্তু আরও সংক্ষেপ করতে হয়েছে, প্রখ্যাতনামা লেখকদের নামও ততই কম দিতে পেরেছি। সেজন্য অনেকে ক্ষুণ্ণ হতে পারেন, তবে সব চেয়ে এ বিষয়ে আমি নিজেই ক্ষুণ্ণ হয়েছি। একমাত্র জিজ্ঞাস্য, যে উদ্দেশ্যে বইখানিতে হাত দিয়েছিলাম তা অনেকটা সিদ্ধ হয়েছে কিনা; সে ভরসা কতদূর করতে পারি, তার বিচার রসিক ও বিবেচক পাঠকসমাজ সময়মত করবেন।

১

সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে অনেকে তা ভাল মনে নেন, কিন্তু অনেকে আবার বিরূপ হন, কেউ কেউ সন্দেহের চোখেও দেখেন। যাঁরা সংসারে কর্ম করাই সার বুঝেছেন, বিশেষ করে যাঁরা অসমসাহসী কর্মী, জীবনের সুখ-বিলাস সম্ভোগ সব ছেড়ে লোক-হিতৈষণায় কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন, তাঁদের পক্ষে প্রশ্ন করা স্বাভাবিক, 'আমাদের কাছে সাহিত্যের আবার দাম কি? জাতীয় জীবনের সঙ্গে তার যোগই বা কি, এবং কোথায়?' ঐ তো আমাদের বিচারের কষ্টি-পাথর—প্রয়োজন, এবং 'জাতীয় জীবনে' প্রয়োজন! কোনও কোনও বন্ধুর সাহিত্যে অনুরাগ সাহিত্যের বিশেষ কোনও বিভাগ পর্যন্ত; কেউ বা ফরমায়েস দেন—'জাতীয় জীবনের' সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগ; স্বাধীনতার কথা ছাড়া যে সাহিত্য, তাঁদের কাছে সে সাহিত্য 'নিরামিষ' বলে মনে হয়। কিন্তু এই সাধারণভাবেই প্রথমে সাহিত্য বস্তুটির পরিচয় নেওয়া যাক; জাতীয় জীবনের কথা ছেড়ে দিয়ে দেখা যাক, জীবনে সাহিত্যের উপযোগিতা কি?

ছেলেবেলা থেকেই এপ্রশ্ন আমাদের মনে জাগে—সাহিত্য-চর্চার দরকারটা কি? অতি পুরাতন প্রশ্ন; কলেজে বিচার করা গেছে, আর্টস, না সায়েন্স? সাহিত্য, না বিজ্ঞান? মনে অমনি প্রশ্ন হয়, সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনও বিরোধিতা

আছে না কি? কোনটার বেশি প্রয়োজন—জীবনের দিক থেকে? কোনটা কাজে লাগবে? অমুক বিষয় পড়ে হবে কি, এ হল চিরন্তন প্রশ্ন; প্রাচীনকালেও গুরুদের এই প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে। কোন শাস্ত্র পড়লে কি ফল হবে, শাস্ত্রচর্চার আগে তাঁদের সেটা ছাত্রকে বুঝিয়ে তবে পড়া সুরু করতে হত। তেমনি পড়ার শেষে ফলশ্রুতি, নিজের মনে একবার হিসাবটা আউড়ে নেওয়া, যে, এই পাঠে আমার এই ফল হওয়ার কথা; যেন কোনও জিনিস বে-হিসাবি না হয়। নইলে পড়তে বা শুনতে আগ্রহই বা হবে কেন? আজকাল ছাত্রদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় বটে; কিন্তু সময় ও আগ্রহ, টাকার চেয়ে অনেক মূল্যবান বস্তু; মূল্য নির্ধারণ করতে গেলে শিক্ষক ও ছাত্র, গুরু ও শিষ্য, বক্তা ও শ্রোতা, উভয়ের দিকই দেখতে হয়।

সেকালের বিদ্যা আলোচনার সম্বন্ধে সব চাইতে আগে মনে পড়ে ব্যাকরণের কথা। ব্যাকরণ শিখতে নাকি লাগত বার বৎসর। দ্বাদশভির্বর্ষৈঃ ব্যাকরণং শ্রূয়তে—একালে আমরা শুনে শিউরে উঠি। সেকালেও ছাত্র বা শিষ্য বা শ্রোতা বার বৎসরের মেয়াদ শুনে উল্লসিত হতেন না নিশ্চয়। পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে ব্যাকরণ পড়ার সার্থকতা বিষয়ে কতকগুলি নির্দেশ আগেই দিয়ে নিয়েছেন; তার একটি বলি। তিনি বলেছেন, ব্যাকরণ পড়লে উচ্চারণ শুদ্ধ হয়; উচ্চারণ ঠিক করা দরকার, না হলে বৈদিক মন্ত্র যথাযথ পাঠ হবে না, মন্ত্র অশুদ্ধ হলে বেদপাঠ যাবে

বৃথায়! 'হেরয়' বলতে যদি 'হেলয়' উচ্চারণ হয়, তা হলে অর্থের জায়গায় অনর্থ হবে। মন্ত্র হল ধর্মের প্রাণ; সেই মন্ত্রই যদি ভুল উচ্চারণ হয়, তবে—! তাই বৈদিক উচ্চারণ শুদ্ধ করবার জন্য কত চেষ্টা! প্রত্যেক পাঠের রীতি আছে, কোন অক্ষর পরিভ্রষ্ট হলে পর, বা যদি হয়, পাঠক সে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য দেবতার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। প্রাচীনকালে বলত, 'পূর্বদেশীয়দের কাছে আশীর্বাদও নিও না, খবরদার! কারণ তাঁরা হয়তো 'শতায়ুর্ভব' বলতে গিয়ে 'হতায়ুর্ভব' বলবেন। যা হোত আশীর্বাদ, তা হবে অভিসম্পাত! কাজ কি বাপু!' সুতরাং ব্যাকরণ শেখার, এবং ভাল করে শেখার, একটা বিশেষ কারণ পাওয়া গেল। এইভাবে ব্যাকরণ শেখার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে ভগবান পতঞ্জলি অনেক কথা বলে গেছেন। আর, ঐ যে বলেছি, শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রপাঠের শেষে পাঠের সুফল সম্বন্ধেও বলতে ছাড়েন না; এই বলার একটা বিশেষ নামও আছে—আগে বলেছি, ফলশ্রুতি। কেন, কোন্ বিশেষ প্রয়োজনে, বিশেষ কথা শুনছি—তার খেয়াল না রাখলে সবটাই যে বানচাল হয়ে যেতে পারে, এক কান দিয়ে ঢুকবে, অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যাবে। এই সম্ভাবনা সেকালেও ছিল, এখনও আছে, তাই প্রথমে এই দিকটা পরিষ্কার করে নেওয়া চাই।

পণ্ডিতেরাও বিশেষ বিশেষ সময়ে সাহিত্যচর্চার নিষেধ করে থাকেন। কেন, তা বোঝা দরকার। আমি জানি, বাংলার কোনও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের কাছে একজন বাঙালী ডেটি

ম্যাজিস্ট্রেট, ইংরিজিতে এম্. এ., দর্শন পড়তে যান—বেদান্ত-দর্শন। পণ্ডিতমশায় পড়াতে রাজি হলেন, তবে এক সর্তে। যতদিন বেদান্ত পড়ানো হবে, ততদিন উপন্যাসাদি সাহিত্য পড়া চলবে না—ওগুলো নাকি বৃথাশাস্ত্র। স্বীকার করব, mental discipline-এর কোনও স্তরে সাহিত্য পড়লে বা কল্পনার চর্চা করলে চিত্তবিক্ষেপ ও সেই সঙ্গে বুদ্ধির ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে। এ-ও না হয় স্বীকার করব, সাহিত্য হল সাধন, সাধ্য নয়, means কিন্তু end নয়, বা end-in-itself নয়। তাই বলে সাহিত্যের প্রয়োজন অসিদ্ধ হয় না। বলতে পারেন, সাহিত্যচর্চা হল স্বপ্নবিলাস, শুধু 'বাতাসে স্বপন বপন করা'—কিন্তু সেকথা বলতে গেলে সত্যকে অস্বীকার করা হয়।

সত্য কথা বলতে কি, আমরা অধিকাংশ লোকেই সাহিত্য ভালবাসি। বিশেষ করে যখন করবার কাজ কমে যায়, ভাববার থাকে প্রচণ্ড অবসর, আকাশের এক ফালি মাত্র যখন চোখের ওপর এসে পড়ে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত যখন আড়াল দিয়ে চলে যায়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, প্রাণ যখন হাঁপিয়ে ওঠে, যাদের চাই তাদের যখন পাই না, তখন গল্প, গান, সাহিত্য-প্রসঙ্গের জন্য মন ছটফট করতে থাকে। কবিতা লেখা তখন বাতিকে পরিণত হতে পারে। যদি প্রকাশ্যে সম্ভব না হয়, লুকিয়ে লুকিয়ে সকলের খাতা দেখে নিলে এ বিষয়ে statistics অর্থাৎ সংখ্যার দিক দিয়ে গুণে স্পষ্ট করে হিসেব করে বলা যায়।

এই ধরণের কর্ম অর্থাৎ কাব্যপ্রচেষ্টা জীবনেরই লক্ষণ। যখন

অনেকটা অবসর মেলে, তখন কল্পনার রং যেন আপনা আপনি ছড়িয়ে যায় চারদিকে। সার্থক সৃষ্টি করার ক্ষমতা হয়তো আমাদের সকলের নাই, তবু এই ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ পরিবেষ্টনীতে সাহিত্যসেবায় (শুধু লেখা নয়, পড়ার, ও সঙ্গে সঙ্গে উপভোগ করার মধ্যেও) জীবনের একটা দিক যেন খুলে যায়। এইভাবে রচিত অনেক কাব্য ও রচনা সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। প্রাচীন যুগে ও বর্তমান কালে, যখনই মানুষকে বাধ্য হয়ে গণ্ডীর মধ্যে থাকতে হয়েছে, তখনই তারই মধ্যে মানুষ অনুভব করেছে নব নব সৃষ্টির প্রেরণা। মনে পড়ে ইতালীয় বোকাৎসিওর ডেকামেরোন। প্লেগের প্রাদুর্ভাবে শহর ছেড়ে ঘরবাড়ী ছেড়ে দল বেঁধে নিভৃত স্থানে পালিয়ে যাওয়ার পরিবেশে এর পরিকল্পনা। জন বেনিয়ান দেনার দরুণ বন্দী অবস্থায় লিখলেন যাত্রিকের গতি—Pilgrim's Progress —ইংরেজি সাহিত্যে তা অমর হয়ে রয়েছে। সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডের অন্তর্যুদ্ধে বন্দী অবস্থায় ইংরেজ কবি রিচার্ড লাভলেস (১৬১৮-৫৮) বলছেন, তাঁর প্রিয়তমা এলথিয়ার প্রেম তাঁকে ধন্য করে তোলে, দেবতারাও সে সুখের আস্বাদ পান না—

When Love with unconfined wings
    Hovers within my gates ;
And my divine Althea brings
    To whisper at the grates ;

When I lie tangled in her hair,
And fettered to her eye ;
The gods, that wanton in the air,
Know no such liberty.

কেন ? তার কারণ তিনি পরে বলেছেন—কারাগারে, পাথরের দেওয়ালে, মানুষের মন আটক পড়ে না, ভেদ করে চলে যায়—

Stone walls do not a prison make
Nor iron bars a cage ;
Minds innocent and quiet take
That for a hermitage.

লাভলেসের এই ক্ষুদ্র কবিতাটিও ইংরেজি সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে। সাহিত্যের অপ্রতিহত অধিকার এতে ঘোষিত হয়েছে।

তা ছাড়া, সাহিত্যের কাজ শুধু অবসরবিনোদ নয়, শুধু Hours of Idleness-এর জন্য নয়, অন্য প্রয়োজনও আছে। আমরা যে গান গাই, যে কথা লিখে রাখি, যে গল্প রচনা করি, প্রবন্ধে যেভাবে যুক্তিজালের অবতারণা করে বক্তব্যটি সাজাই, তার মধ্যে আমাদের অজ্ঞাতসারে অনেক চিহ্নই রেখে যাচ্ছি, ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকেরা তা থেকে সমাজের একটা নকসা খাড়া করতে চেষ্টা করবেন। এখনকার দিনে আমরা ভাবছি, ভারতচন্দ্রের লেখা থেকে তখনকার দিনে কৃষ্ণনগরের তথা বাংলা দেশের একটা ছায়া পাওয়া যায় কিনা ; কবিকংকণের চণ্ডীকাব্য ও মহাপ্রভুর জীবনী মিলিয়ে সপ্তদশ শতকের বাংলার

একটা ধারণা আমরা করতে পারি কি না। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য—বিশেষ করে মধ্যযুগের সাহিত্য, কারণ প্রাচীন সাহিত্যে উপাদানের অভাব অত্যন্ত—আলোচনার এই হল আর একটা দিক। বর্তমান যুগের বাংলাসাহিত্য থেকে আধুনিক কালের সমাজের কোনও আভাস পাওয়া যায় কিনা, এ কথা অনেকে জিজ্ঞাসা করে থাকেন। তাঁরা যদি অতীতে সন্ধান করতে আরম্ভ করেন, তা হলে হয়তো কিছুটা সন্ধান পেতেও পারেন, এখনকার ব্যাপারে বাঁশবনে ডোমকানা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে এই ধরণের খোঁজ খবর করতে গেলে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে সাহিত্য পড়তে গেলে মনে রাখতে হবে যে, কোনও বিষয়ের সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে সাহিত্য ও অন্যান্য উপকরণের সমবায়ের উপর, নইলে তা টেকসই হবে না।

পরবর্তীকালে জীবনে সাহিত্যের উপযোগিতা বুঝা যায়। যেমন অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, ছেলে বেলায় আবার জিওমেট্রি পড়া কেন? ইউক্লিড কেন? ওসব না পড়লে ক্ষতি কি? সংযুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট স্বনামধন্য এব্রাহাম লিংকনের কথা মনে পড়ে। তিনি নিজের চেষ্টায় প্রতিকূল পরিবেশের মাঝে থেকেও বেশি বয়সে লেখাপড়া শিখেছিলেন, কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়; তারপর আইন পড়বার জন্য শহরে যেমন রওনা হয়েছেন তখন পথে শুনলেন যে 'প্রমাণ' বলে একটা কথা আছে, তারও শাস্ত্র আছে, এবং ইউক্লিডের জ্যামিতি থেকে প্রমাণ কিসে হয়, তার বিষয়ে একটা মোটামুটি ধারণা জন্মে। অমনি তিনি বাড়ি

ফিরে গেলেন, ও ইউক্লিড পড়ে শিখে তবে আইন পড়ার জন্য শহরে আসেন। লোকে যেমন দাঁত থাকতে তার মূল্যমর্যাদা বোঝে না আমরাও তেমনি জ্যামিতি পড়বার সময় মনে করি, ও পড়াটা একেবারেই অনর্থক। সাহিত্য মানুষের জীবনে কত-খানি, সে কথাও আমরা সাহিত্য পড়বার সময়ে খেয়াল করি না। কিন্তু মনে পড়ে. প্রসিদ্ধ বীর যোদ্ধা কানাডা দমন করতে গেছেন : গভীর রাত্রি, অনুগত সৈনিকদের সঙ্গে তরুণ সেনানী দুরারোহ পথ বেয়ে চলেছেন – শত্রুশিবির আক্রমণে। কবি গ্রের লেখা Elegy written in a country churchyard নামে কবিতাটির কিছু অংশ যোদ্ধা আবৃত্তি করেছেন আর সঙ্গী-দের বলছেন. ভাই সব আজকার যুদ্ধ জয়ী হওয়ার চেয়েও আমার লোভ হয়, ঐ কাব্যের খানিকটাও যদি রচনা করতে পারতাম !—সেই রাত্রে তিনি যুদ্ধ জিতেছিলেন, অবশ্য তাঁর নিজের প্রাণের বিনিময়ে। ইংলণ্ডের ইতিহাসে দুইজন রাজনৈতিক নেতার কথা স্মরণ করি : গত আশী বৎসরের মধ্যে। একজন হলেন গ্ল্যাডস্টোন, যাঁর উদারনৈতিক চিন্তা ও কর্ম ভিক্টোরিয়ার যুগের গৌরব বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। তিনি কিন্তু যেমন রাজনৈতিক বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন, তেমনি ছিলেন ক্লাসিক (অর্থাৎ গ্রীক) সাহিত্যে সুপণ্ডিত। পার্লামেণ্টে মাঝে মাঝে কূট রাজনৈতিক সংকটে পড়লে তিনি মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্য চিত্তের স্থৈর্য সম্পাদনের জন্য দীর্ঘ ষাণ্মাত্রিক (hexameter) ছন্দের কবিতা আবৃত্তি

করতেন, হোমরের মহাকাব্য থেকে; ছেলেবেলায় প্রাচীন সাহিত্যের পরিচয় তাঁর পক্ষে একেবারে অনর্থক হয় নাই। ইংলণ্ডের অদ্ভুতকর্মা মন্ত্রী চার্চিল যৌবনে ও প্রৌঢ় বয়সেও ছবি আঁকা, বেহালা বাজানো প্রভৃতি সুকুমার কলায় কম প্রবীণ ছিলেন না; রুজভেল্ট চার্চিলকে বেতারে সম্বোধন করবার সময় লংফেলোর কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন, বেতারে বলবার সময় চার্চিল সমরসংকটে ইংরেজ কবি ক্লাউফের সেই প্রসিদ্ধ চরণ কয়টি উদ্ধৃত করে তাঁর শ্রোতাদের প্রাণে আশার সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন—'সমুদ্রের ক্লান্তিবিহীন তরঙ্গমালার আঘাতের মত, ঊষার অরুণরাগের অলক্ষিত অভিযানের মত, আমাদের অগ্রগতি হয়তো আমরা বুঝতে পারছি না, তাই বলে অধীর হয়ো না, মনে করোনা আমাদের সংগ্রাম বুঝি বৃথায় গেল'। উত্তর আফ্রিকা জয়ের আশায় তিনি তাঁর বক্তৃতার মধ্যে আবার সাম্রাজ্যবাদী কবি কিপ্‌লিং-এর কবিতা বেতারে আবৃত্তি করেন।

এমনিভাবে কোন কবিতার দুই একটা জোরালো চরণ যখন আমাদের মনে পড়ে, তখন তার উপযোগিতা খানিকটা বুঝতে পারা যায়। মনটা যখন ঝিমিয়ে পড়ে তখন সে কবিতা হয় ভেরীর নাদের মত—ঘুমের ঘোর যায় ভেঙ্গে, মনে আসে সাহস, পা যেন জোরে জোরে এগিয়ে চলতে চায়। প্রায় চল্লিশ বছর আগে একবার ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মধ্যে কয়েকটি চরণের সারাংশ লিখতে দেওয়া হয়েছিল ঃ—

Who shall be nearest,
Noblest and dearest,
Who shall be in our hearts evermore ?
He the undaunted
Whose banner is planted
On glory's high ramparts and battlements hoar.
Fearless to danger,
To Falsehood a stranger,
Looking not back while there's duty before——
He shall be nearest,
Noblest and dearest,
He shall be in our hearts evermore.

গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে অনেকবার এই কয়টি চরণ আমার মনে তোলপাড় করেছে, কিংবা আত্মবিসর্জনের ও দুঃখ-বরণের কথায় অনেকবার মনে পড়েছে রবীন্দ্রনাথের সেই অনুপম ছত্র কয়টি—

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী—
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই !
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

অমনি কি মনটায় সাহস পাই না, হৃদয়ে কি বল আসে না ? এইভাবে সাহিত্য থেকে জীবনের ভাণ্ডারে অনেক রত্ন সঞ্চিত হয়। এমন কি, জাতীয় জীবনেও যে শান্তি ও স্থৈর্যের প্রয়োজন আছে, সাহিত্য হতে তার কিছু উপাদান আমরা পাই। অন্তরের

যে সমৃদ্ধি আমরা সাহিত্যালোচনার ফলে পেতে পারি, তার মূল্য বড় কম নয়।

আমরা নানাভাবে নানাদিকে সৃষ্টি করে চলি, সৃষ্টি করতে চাই; সৃষ্টি করার সহজ চেষ্টার ফলেই সাহিত্য গড়ে ওঠে, যেন সৃষ্টির দ্বার খুলে দেয়। শুধু প্রতিভাবান ব্যক্তির সম্পর্কেই একথা সত্য নয়—অতি সাধারণ লোকও একটা নতুন সন্ধান পায়, তবে তার সৃষ্টি আর প্রতিভাবানের সৃষ্টি অবশ্য একদরের নয়, দুটোতে প্রভেদ বিস্তর। ভাল গান যে ব্যক্তি গাইতে পারে, তার তো কথাই নাই, যে তা পারে না তার নিজের গানে আনন্দ লাভ করাও সামান্য নয়। সাহিত্যের পথে নূতনতর নিভৃততর জীবন লাভ করে মানুষ ধন্য হয়। এদিক দিয়ে যে খোলা আছে মুক্তির পথ, বাঁচবার পথ। Inner Life—অন্তর্জীবন বলতে আমরা অনেক কিছু বুঝি বা বোঝাতে চাই। দুর্লভ মানবজীবন পেয়েও যার সেই জীবন বদ্ধ হয়েই রইল, সঙ্গীত সাহিত্য শিল্পের মিহি সুর যার কানে ধরা দিল না, কল্প-জগতের চাবিকাঠি যার মিলল না, তার মত হতভাগ্য কে! সাহিত্য ও ঐ জাতীয় বিদ্যার অবহেলা করলে সে চাবিকাঠি যে আমাদের হারিয়ে যাবে, সে কথা ভুললে চলবে না।

সাহিত্য সকলের সঙ্গে যুক্তও করে; যারা চর্চা করে, যারা রচনা করে, পড়ে শোনায় ও শোনে, সকলকে এক ভূমিতে এনে বসায়। বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তারা নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। 'সহিত'-এর ভাবই

সাহিত্য ; সকলে একসঙ্গে বসবার, ভাববার, ভালমন্দ লাগা-না-লাগার বিচার করবার অবসর পেলে সাহিত্য-চর্চার মধ্য দিয়ে নতুন এক ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। আবার নিভৃতে, সকলের থেকে পৃথক হয়ে থাকারও প্রয়োজন আছে। স্থান-কালের, দূর ও নিকটের মধ্যে সাহিত্য বেঁধে দেয় সেতু ; এই সাহিত্যের মধ্য দিয়েই আমরা বহু বিচিত্রপ্রকৃতির লোকের সংস্পর্শে এসে থাকি।

সাহিত্য করে কি ? কেউ কেউ বলেছেন, জীবনকে বিচার করে, criticism of life ; কিন্তু সমগ্র জীবন তো নয়—সমগ্র জীবনের ছাপ সাহিত্যে পড়ে না। জীবন বহুব্যাপক ; তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গীকে সাহিত্যিক তাঁর রচনার মধ্যে রূপ দিলেন, সমকালীন সমাজ সম্বন্ধে তাকেই কি সত্য বলে মনে করা উচিত ? কেউ কেউ তো বলেন, সাহিত্যে ফাঁকি দেবার জো নাই—স্রষ্টার স্বরূপ তাতে ধরা পড়ে যায়, sincerity-র সঠিক পরিমাপ সাহিত্য বিশ্লেষণেই সম্ভব। কোনও যুগেই সাহিত্য তার পরিবেশকে ছাড়িয়ে অর্থাৎ একেবারে ফাঁকি দিয়ে যেতে পারে না, যদিও সাহিত্য কখনও কখনও ফাঁকির পথও খুঁজে বেড়ায়, তখন তার বিশেষণ আমরা দিই escapist বলে। যেমন কীটসের কাব্যকে কেউ কেউ ঐ বিশেষণে অভিহিত করে থাকেন, কারণ তাঁরা বলেন, সুন্দরের সন্ধানে গিয়ে কবি তাঁর সমসাময়িক জগতের দুঃখদুর্দশার বিষয়ে অবহেলা করেছিলেন, তাদের থেকে পালিয়ে যেন সুন্দরের সন্ধান করছিলেন ! সে কথা

সত্য না হলেও সমগ্র জীবনকে, জী নের সমগ্র স্তরকে, আমরা সাহিত্যের মধ্যে গ্রহণ করতে পারি না। গ্রীক সাহিত্য জগতের গৌরব, এবং চিরন্তন আদর্শের মধ্যে নিজের একটা স্থান করে নিয়েছে : কিন্তু সে সাহিত্যও দরবারি সাহিত্য ; যারা সমাজে গণ্যমান্য তারাই ও সাহিত্য রচনা করেছে, জনগণের-মনের ছাপ ওতে কোথায় ? যারা দাস, যারা helot, slave, তাদের সুর ওর মধ্যে স্থান পায় নাই। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য বিঘ্নবিনাশন গণেশের স্তুতিবন্দনা করলেও গণদেবতার গান গায় নাই। আজও যারা সর্বহারার গান গাইতে চেয়েছে, তারাও পেরেছে কি ? আমরা বংশ, পরিবার, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সমৃদ্ধি—এসব বন্ধন হতে মুক্ত নই, এদের চিহ্ন আমাদের চিন্তাধারায়, আমাদের রুচিতে, আমাদের ভাষায়, আমাদের প্রকাশভঙ্গীতে। ব্যক্তি:ত্বর, বিশিষ্টতার ছাপ সাহিত্যে স্পষ্ট।

দেশে শান্তি বিরাজ না করলে সাহিত্য প্রভৃতির চর্চা হতে পারে না, এমন কথা নয়। রাজনৈতিক অশান্তির সময়ে, দেশের মহাসংকটের মাঝে বহুমূল্য কাব্য, অপূর্ব দার্শনিক সিদ্ধান্ত রচিত হয়েছে। সাহিত্য যে শুধু criticism of life, এ ঘটনাগুলি তা খণ্ডন করে। এসব আলোচনার মধ্যে মনে পড়ে যায় দার্শনিক হেগেলের কথা। ফরাসীরা যখন জেনা নগর অধিকার করে, সারারাত যখন শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলেছে, তখন তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছেন ! বাইরের কথা একেবারে ভুলে গেছেন—কিছুতেই আর হুঁস

নাই। গোলাগুলির আওয়াজ কানে যায় নি। ভোর বেলায় তাঁর সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তাই নিয়ে তিনি ছুটলেন বন্ধুদের জানাতে। পথে এসে দেখেন, বিদেশী সৈন্য বিজয়ী হয়ে সমস্ত শহরে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। হেগেলের মত লোক 'escape' করতে চান না, ফাঁকি দিতে চান না, বাইরের ক্ষণিক দুর্যোগ সম্বন্ধে অচেতন হয়েও তাঁরা জনমনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যোগ রেখে চলেছেন, চিরকালের জনস্রোতের সঙ্গে তাঁদের যোগ, আর তাঁদের দৃষ্টি মানবসমাজের স্থায়ী প্রয়োজনে নিবদ্ধ। তাঁদের দায়িত্ব সর্বকালের সর্বদেশের মানবসমাজের কাছে।

অনেকে মনে করেন, সাহিত্যের সঙ্গে বুঝি সত্যের কোনও সম্পর্ক নাই, ও হল গিয়ে বৃথা বা মিথ্যা বিদ্যা। খ্রীষ্টের বিচার করতে গিয়ে পিলাত অবশ্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সত্য কি? সত্য কাকে বলে? উত্তর শুনবার ধৈর্য সেদিন তাঁর ছিল না। কবির সত্য কতদূর সত্য, তার উত্তর রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বয়সের কবিতায় দিয়ে গেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, আমাদের বহু প্রশ্নেরই উত্তর কবি দিয়েছেন, সেগুলো এক সময়ে যে তাঁরও প্রশ্ন ছিল।—"ভাষা ও ছন্দ" কবিতায় তিনি নারদের মুখে কবিগুরু বাল্মীকির প্রতি জানিয়েছেন—

"কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

যে রাম বাল্মীকির সৃষ্টি, তার মূল্য কি "বাস্তব" রামের চেয়ে ঢের বেশি সত্য নয়?

সাহিত্য, অর্থাৎ কাব্যধর্মী সাহিত্য, কি তার সংজ্ঞা? "রসাত্মক বাক্য", এই বলে আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা তার সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন। কিন্তু রস কি? তার বর্ণনা করবার চেষ্টামাত্র করেই সকলে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে আছে, ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নি, অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কি পদার্থ তা কেউ বলতে পারে নি; রসকেও সেই জাতীয় বলা যেতে পারে। কাব্যানন্দ, যে কাব্যের প্রাণবস্তু হল রস, তার আনন্দকে —কবিরা নয়—সমালোচকেরা বিচারদৃষ্টিতে দেখে বলেছেন, 'ব্রহ্মস্বাদসহোদরঃ'। সাহিত্যের উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে এত বড় কথা আমাদের প্রাচীনেরা বলে গেছেন। একথা মনে রেখে সাহিত্যের আদর্শ, সাহিত্যের লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের দেশের সাহিত্যিকের ভাবা উচিত। যা আমাদের সঞ্জীবিত করে (রস্যতে), তাই হল রসাত্মক বাক্য, অর্থাৎ কাব্য, অর্থাৎ কাব্যধর্মী সাহিত্য।

সাহিত্যিককে তাই হতে হবে রসিক। সাহিত্যসমালোচকের পক্ষে গোমরামুখো হয়ে বসে থাকা একেবারে অস্বাভাবিক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, সকল দেশের সাহিত্যেরই অন্যতম লক্ষ্য থাকে, পরস্পরের মধ্যে প্রীতিবর্ধন। সামাজিকতা, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক, সাহিত্যচর্চা করতে গিয়ে এইটেই বাড়বে। একটা মেলামেশার সমভূমিতে খুসির আদান-প্রদান হয় সাহিত্যের দৌলতে। যাঁরা সাহিত্যিক বা সাহিত্যসমালোচক বা সাহিত্যের অনুরাগী ভক্ত, তাঁদের মধ্যে দলাদলি রেষারেষির ভাব থাকা

তাই বিশেষ করে অনুচিত ; প্রীতি সংস্থাপনই যে সাহিত্যের কাজ, রস যে একত্র করে, পৃথক করে না। তবু মানুষের জীবনে অসম্পূর্ণতা আছে ; দ্বন্দ্বাতীত হতে পারে কজন ? আমরা অধিকাংশ লোকই কখনও অতি ভাল, আবার কখনও অতি মন্দ। তাই সাহিত্যচর্চা করতে গিয়েও সব সময় শান্ত, উদার, সংযত দৃষ্টি রাখতে পারি না।

সাহিত্য আলোচনা বা সৃষ্টি করতে গেলে নিজের বাইরে আসতে হবে ; যাঁরা অন্তর্লোকে উদ্ভাসিত হয়ে অন্তর্লোকেই বিরাজ করেন, তাঁদের সংখ্যা বড় অল্প—তাঁদের কথা বলছি না। কিন্তু অধিকাংশেরই কল্পনা খেলে নিজের বাইরে ; এই সম্বন্ধে একটা গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। দণ্ডী ছিলেন সন্ন্যাসী মানুষ ; কিন্তু তাঁর "দশকুমারচরিত" সম্পূর্ণ অন্য ধরণের রচনা—শান্তরসের কি নিবৃত্তিমার্গের নয়, তাতে ভোগবিলাসের বর্ণনা-বাহুল্য আছে। যে রাজার সভায় দণ্ডী আসা-যাওয়া করতেন তিনি একদিন রহস্য করে কবিকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি দশকুমারচরিতের মত বই কি করে রচনা করলেন ?" দণ্ডী একথার উত্তর না দিয়ে সেদিন নীরবে হেসেছিলেন মাত্র। কয়েকদিন পরে তিনি রাজাকে দারিদ্র্য বিষয়ে কিছু শ্লোক রচনা করতে অনুরোধ করেন। তখনকার কালে পেশাদারি সাহিত্য ছিল না ; শ্লোক রচনা করতে সকলেই বেশ অভ্যস্ত ছিলেন, আর এই রাজা ছিলেন তার মধ্যে রীতিমত পণ্ডিত ও কবি। তিনি চমৎকার শ্লোক রচনা করে দিলেন, দারিদ্র্য বর্ণনা প্রসঙ্গে

বললেন, আমি এমন দরিদ্র যে বিড়ালও আমার ঘরে প্রবেশ করে না, ইত্যাদি, যেন সত্য সত্যই তাঁর এবিষয়ে গভীর অভিজ্ঞতা আছে! দণ্ডী এইভাবে রাজার প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর দিলেন। সাহিত্যিকের কাজই হল এই—অন্যের মন দিয়ে তার সুখসম্পত্তি দুঃখদারিদ্র্য আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে সেই অনুভূতিকে ভাষা দিয়ে অলঙ্কারে সাজিয়ে ফুটিয়ে তোলা, অপরের বিষাদ-আনন্দ নিজের বিষাদ-আনন্দে রূপান্তরিত করা। এই রূপায়নের শক্তি না থাকলে কাব্য পড়াও চলে না, রচনা তো দূরের কথা। ম্যাকবেথ-হ্যামলেট পড়তে পড়তে যদি দুরাকাঙ্ক্ষার উন্মাদনী শক্তি, কর্তব্যনির্ণয়ে দ্বিধার ভাব, অনুভব করতে না পারি, শুধুই ব্যাকরণের নিয়ম আর সমালোচনার বাঁধা বুলি আওড়াই, বা ভেবে ভেবে নতুন দিকও যদি দেখতে পাই, তাহলেও, বর্ণিত সমস্যা বা চরিত্র যতক্ষণ আমাদের অনুভূতির অঙ্গ হয়ে না ওঠে, ততক্ষণ আমাদের পড়া হবে বৃথা—অবশ্য সাহিত্যপাঠের দিক দিয়ে একথা বলছি। ভগবদ্‌গীতা যিনি নিত্য পড়েন, যাঁর উচ্চারণ শুদ্ধ, দর্শন ব্যাকরণ সম্বন্ধে যাঁর পাণ্ডিত্য নিশ্চিত, টীকা টিপ্পনী যাঁর ভাল করে পড়া আছে, তাঁর চেয়েও তার পক্ষেই গীতা পড়া সার, যে সেই পাঠে নিয়ে আসে তার অভিজ্ঞতা, নিয়ে আসে তার সংশয়িত চিত্তকে, ভগবদ্‌বাণী শুনে কর্মে স্থির হওয়ার জন্য। দোকানী রাত জেগে রামায়ণ পড়ে, কখনও কাঁদে কখনও হাসে, তার সেই পড়া অনেক বিদ্বান পণ্ডিতের রামায়ণ বিশ্লেষণের চেয়ে রসের

দিক দিয়ে সার্থক। আমরা, যারা পোষাকী ভাবে পড়ি, আমাদের মনটা থাকে আলগা হয়ে, মাঝে মাঝে চলে যায় অন্য জায়গায়, হাসি-কান্নার দোলে দুলে ওঠে না। আমাদের সেই পাঠ ঐ দোকানীর পাঠের তুলনায় বিফল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রসসৃষ্টি হল কি না বুঝবে কে? রস পরখ করবে কে? শাস্ত্রকারেরা লিখে গেছেন—রস সহৃদয়বেদ্য। যার হৃদয় আছে, সে সাহিত্যের জহুরী। জহুরীরও শিক্ষা চাই, শক্তি চাই, বস্তুর সঙ্গে পরিচয় চাই! রসের চূড়ান্ত বিচার জনগণমনের উপর নির্ভর করে না, ভোট দিয়ে এ বিচার নিষ্পন্ন হবে না। "না হলে রসিক সুজন———।" সাহিত্যের দরবারে ডেমোক্রাসির অধিকার চলবে না, সেখানে রসিকের অধিকার, একটা 'এরিস্টোক্রেসি' মানতেই হবে। এ দেউড়ি পার হলে তবে সাহিত্য গণদেবতার কাছে গিয়ে পৌঁছবে। চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে রাধাকৃষ্ণলীলা নিয়ে রচিত বহু নাটক এসে পৌঁছত; রায় রামানন্দ আর স্বরূপ দামোদর, এই দুই জনের উপর ছিল তাদের পরীক্ষার ভার। তাই বলে সাধারণের রসবিচার করবার শক্তি নাই, একথাও বলা চলে না; লোক-সাহিত্য রচনা করতে গেলেই যে সাহিত্যকে গ্রাম্য করে তুলতে হবে, এমন কোন কথা নাই। সৎসাহিত্যও জনপ্রিয় হতে পারে, এবং সাময়িক বিচারে যাই হোক, অধিকাংশ সময়ে জনপ্রিয় হয়েও থাকে। আমাদের দেশে মনসামঙ্গল, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত সাধারণের ~~কাছে এই~~ভাবে আদর পেয়েছে।

কেউ কেউ তাই সাহিত্য সৃষ্টি করেন, সমসাময়িকদের সমাদরের অপেক্ষা না রেখে। 'ভাবী কাল' সেই সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ করবে, এই কথা তাঁরা বলে থাকেন। কাল তো বিচার করবেই ; কিন্তু সমসাময়িকদের প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাবও তাঁদের মনের মধ্যে থাকে। তাঁদেরই হয়ে ভবভূতি বলেছিলেন—

যে নাম কতিচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতে মম কোঽপি সমানধর্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী॥

অধিকাংশ লেখকই কিন্তু প্রশংসা নইলে বাঁচতে পারেন না! কীট্‌সের মৃত্যু অবশ্য প্রতিকূল সমালোচনার জন্যই হয় নি, অন্য কারণে ঘটেছিল : কিন্তু ভাবপ্রবণ মনে নিন্দা শেলের মত গিয়ে বেঁধে। বিরুদ্ধ সমালোচনা হলে কবিরা ক্ষুণ্ণ হন ; তাই সেকালে তাঁদের নাম দেওয়া হয়েছিল—that irritable race of poets ; একালেও সে কথা যে বলা চলে, তা সকলেই স্বীকার করবেন, যদি নিজেরা কবি না হন। 'কবিতা ভাল হয় নি' বলাতে সময় সময় বন্ধুবিচ্ছেদ পর্যন্ত ঘটেছে। অনেক বড় বড় কবিও একটু সমাদরের জন্য লালায়িত। প্রশংসা চান বলে তাঁদের রচনার কোনও মূল্য নেই, একথা বলা কিন্তু কোন ক্রমেই ঠিক হবে না।

অনেক সময় আবার দেখা যায়, প্রশংসার ফলে অনুকূল আবহাওয়ায় সাহিত্যসৃষ্টি সুন্দরতর হয়েছে। তখন হয়তো তার তেমন দাম নেই, কিন্তু চারিদিকের সহানুভূতি লাভ করে কবি সাধনার পথে অগ্রসর হন, সৌন্দর্যলক্ষ্মীর উপাসনায় তাঁর তৎপরতা বাড়ে। অভিজ্ঞ সমালোচকের দায়িত্ব তাই খুব বেশি। Absolute criticism সর্বদা চলে না। তাই যখন দেখি যে আমার মতে যে বইখানির দাম বেশি নয় আর কেউ তার খুব প্রশংসা করেছেন, তখন সাবধান হয়ে যাই। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে একথা বলতেও পারা যায় যে, বহু লেখক সাহিত্যসাধনার আরম্ভে যেমন লিখতেন সাধনার ফলে তার চেয়ে আরও ভাল লিখেছেন ;—অবশ্য এ কথাটা শোনাল যেন ফাঁকা সার্টিফিকেটের মত, কিন্তু এর অর্থ আছে। নবীন লেখকদের সমালোচনায় তাই সমালোচকদের বিশেষ সতর্ক হতে হয়।

পূর্বে বলেছি, রস হল সহৃদয়বেদ্য। সাহিত্য হল হৃদয়ের, রসের, রুচির অনুভূতি। এর ক্ষেত্র মগজ বা বুদ্ধি ততটা নয়, যতটা কল্পনা ; শুচিতা ততটা নয়, যতটা সরসতা! তাই অপণ্ডিতও এর রস আস্বাদনের অধিকারী, পণ্ডিতেরও রসে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা। তবে সাহিত্যের পরিপূর্ণ আনন্দ-ঘন রূপটি কার কাছে কতটা ধরা দেবে, তা অবশ্য বিচার্য। যার যতখানি যোগ্যতা, সে ততখানি আদায় করে নিতে পারবে। খানিকটা যোগ্যতা থাকলে একেবারে ফাঁক কেউ যাবে না।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা ইস্কুলের ছেলে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আর কর্মশ্রান্ত বিরামবিরল অন্তঃপুরিকা সকলেই উপভোগ করবেন ও নিজ নিজ জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করবেন—তবে সমান পরিমাণে নয়, এই যা।

সাহিত্য আলোচনার রীতিভেদ আছে। কমলাকান্তের দপ্তরের পত্র তার রসের জন্য ভাল লাগে; তত্ত্বকথার জন্যও পড়ি বটে। বঙ্কিমচন্দ্রেরই অন্য লেখা মিলিয়ে পড়লে কমলাকান্তের সে দপ্তরের রস হয় আরও একটু জমাট। যখন মনে করি যে ও লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাট সাহিত্য-ঐশ্বর্যের একদেশ মাত্র তখন আবার তার উপলব্ধি হয় অন্য ধরণে; আবার ও লেখা উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর জীবনের ও চিন্তার ছবি; সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকায় ফেললে তবে সে সৃষ্টির উদার অর্থ পরিস্ফুট হবে। এইরূপে, কোনও বিশেষ রচনার অর্থ আমরা নানাদিক দিয়ে বুঝতে পারি। অনেকের মতে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে সাহিত্য আলোচনা করাই সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ রীতি। আলোচনার বিষয়বস্তুও যেমন, রীতিও তেমন, যুগে যুগে বদলাচ্ছে। এখানে এ বিষয়ে এই পর্যন্ত বলেই ক্ষান্ত হওয়া ভাল।

রচনার পরিমাণ দিয়ে সাহিত্যসৃষ্টির বিচার হয় না। ধারে কাটা চাই; খানিকটা ধার থাকা চাই; শুধু ভারের এ ব্যাপারে দাম নেই। কবিরা কেউ বা ছোট্ট চার লাইনের একটি কবিতায় অমর হয়ে রয়েছেন, কারো কাব্যসৃষ্টি হয়তো বহু বিচিত্র

রসসম্ভারে পরিপুষ্ট। গ্রে বেশি লেখেন নি, তবু, তিনি ঐ 'এলিজি' লিখেই ইংরেজি সাহিত্যে অমর হয়ে রইলেন। ল্যাণ্ডর পণ্ডিত, তীক্ষ্ণধী, রূপকার সাহিত্যিক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর Rose Aylmer কবিতাটি স্বল্প চরণেই অমর হয়ে রইল। এই কথাই কবিগুরু কত চমৎকার করে বলেছেন তাঁর 'শেষ বর্ষণে' নটরাজের মুখ দিয়ে—'মহারাজ, রসের ওজন আয়তনে নয়! সমস্ত গাছ একদিকে, একটি ফুল একদিকে, তবু ওজন ঠিক থাকে। অসীম অন্ধকার একদিকে, একটি তারা একদিকে, তাতেও ওজনের ভুল হয় না'।...বেশি লেখার বিপদও আবার আছে—মিলটন লিখেছেন অনেক, রচনার গুণও অবিসংবাদিত, কিন্তু সত্য কথা বলতে কি—পড়ে কয় জন?

একটি বিশেষ সাহিত্যকে জানতে হলে অন্যান্য সাহিত্যেরও আলোচনা আবশ্যক, অন্যান্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় থাকলে সুবিধা হয়। আমার জনৈক বন্ধু বলে থাকেন, ইংরেজি সাহিত্য না জানলে বাংলা সাহিত্য পড়া বা বোঝা যায় না। এক এক ভাষার মত এক এক সাহিত্য জানাও নতুন নতুন শক্তি অর্জন করা। তবে পূর্বে যেমন বলেছি, যতখানি শক্তি ও যোগ্যতা নিয়ে চর্চা করব, ততখানি আনন্দ পাব, ততখানি বুঝতে পারব। মনে রাখতে হবে, শক্তির পরিচয় হবে অবশ্য তার সংযত প্রয়োগে, আবার পল্লবগ্রাহিতাও ভাল নয়।

বক্তা ও শ্রোতার যোগ সাহিত্য ব্যাপারে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। কবি বলে গেছেন, "একাকী গায়কের নহে তো গান,

গাহিতে হবে দুইজনে।” গান যে দুইজনের, গায়কেরও বটে শ্রোতারও বটে, এই কথাটা মনে রাখতে হবে। যাঁর কাব্য পড়ব, যাঁর নাটক দেখব, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে হবে, তাঁর মন নিয়ে পড়তে হবে—অবশ্য, যতদূর পারা যায়। ক্ষণেকের জন্য লেখকের সঙ্গে পাঠকের একাত্মবোধ না জন্মালে তা সম্ভব নয়; কালিদাসের কাব্য বুঝতে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে কালিদাসের ভূমিতেই উঠতে হবে. নইলে তাঁর বাণীর সার্থকতা কি? শেলীর কবিতা পড়তে পড়তে যদি অতীন্দ্রিয় রাজ্যে না উঠতে পারি, ইকবলের কবিতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দর্শনের যোগ যদি পাঠকের মধ্যে না হয়, তবে যে অনেকখানি যাবে ব্যর্থ হয়ে। এক কথায় এই গুণটিকে বলা চলে sympathy, সমরসত্ব। পাঠকের বা শ্রোতার এই সমরসত্ব বা sympathy নইলে চলে না।

সাহিত্যবিচারে তিনখানি বইয়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পরে, যা পড়লে পাঠকের আলোচনা ও বোধের দিকে সুবিধা হবে। প্রথম, হডসনের Introduction to the Study of Literature; প্রথম শিক্ষার্থী শুধু নয়, সকলের পক্ষেই এই বইখানি পড়া ভাল। দ্বিতীয়, অতুলবাবুর কাব্যজিজ্ঞাসা। প্রাচীনদের দৃষ্টিভঙ্গী অতুলবাবু সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছেন। বলে রাখা ভাল, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও, পাশ্চাত্য ভাবের আলোড়নে সংক্ষুব্ধ জগতেও, সংস্কৃত ভাষায় চিরকালের জন্য অপরিম্লান যে কয়টি শাস্ত্রের জ্যোতি জ্বল জ্বল করছে তাদের মধ্যে

অলংকারশাস্ত্র বা সাহিত্যশাস্ত্র অন্যতম। এর সিদ্ধান্ত এখনও অকাট্য, ভারতের মনীষা এদিকেও অনবদ্য। সুতরাং এই বইখানি স্বচ্ছন্দে পাঠকের হাতে দেওয়া যায়। তৃতীয় বইখানি হল, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য। তার মধ্যে আছে কবি-শিল্পীর অপূর্ব বিচার ও রসবোধ, যা কি না পাঠককে নতুন নতুন ভংগীর সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়।

কবি কেন কাব্যসাধনা করেন? কবিও তো নিতান্ত ভূঁই-ফোঁড় নন, তাঁরও সাধনার প্রয়োজন আছে। আর এ-সাধনা অপার্থিব. নাম-যশ টাকা-কড়ি কিছুই এতে হবার নয়, যদি হয় তাহলে নিতান্ত দৈবানুগ্রহ, যাকে বলে accident – হিসাবের মধ্যে নয়। পরবর্তী জীবনে কবি এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, প্রথম জীবনে একথা তাঁকে বিচার করতে হয়েছিল — সন্ধ্যা-সংগীতের 'গান-সমাপনে' মনে হয় কবি যেন নিজের কথাই বলেছেন—

এমন পণ্ডিত কত রয়েছেন শত শত
এ সংসার-তলে,
আকাশের দৈত্যবালা উন্মাদিনী চপলারে
বেঁধে রাখে দাসত্বের লোহার শিকলে।
আকাশ ধরিয়া হাতে নক্ষত্র-অক্ষর দেখি'
গ্রন্থপাঠ করিছেন তাঁরা,
জ্ঞানের বন্ধন যত ছিন্ন করে দিতেছেন
ভাঙি ফেলি' অতীতের কারা।

আমি তার কিছুই করি না,
আমি তার কিছুই জানি না।
এমন মহান্ এ সংসারে
জ্ঞান-রত্নরাশির মাঝারে,
আমি দীন শুধু গান গাই,
তোমাদের মুখপানে চাই।
ভালো যদি না লাগে সে গান,
ভালো সখা, তাও গাহিব না।

যে যুগে বিজ্ঞানের সাধনা বাঙ্গালীকে জীবনের একটা নতুন দিক ধরিয়ে দিল, সে যুগে আচার্য জগদীশ যাঁর সখা সেই তরুণ কবির হৃদয়েও বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহের স্পন্দন এসেছিল, কিন্তু তিনি তখনই তাঁর সাধনার মাধুর্যে বিভোর, অন্য পথে যাবার জো কোথায়! কবিগুরু বাল্মীকিরও মনে দ্বন্দ্ব এসেছিল. স্বয়ং কমলা এসে তাঁকে অর্থলোভ দেখিয়েছিলেন, বাল্মীকি-প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথ শুধু বাল্মীকির নয়, সব কবিরই হৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন,—

কমলা দিতেছি আসি, রতন রাশি রাশি, ফুটুক তবে হাসি
মলিন মুখে।
কমলা যারে চায়. বলো সে কী না পায়, দুখের এ ধরায়
থাকে সে সুখে;
ত্যজিয়া কমলাসনে, এসেছি ঘোর বনে, আমারে শুভক্ষণে
হেরো গো চোখে!

বাল্মীকি উত্তর দিলেন, চাই না ও অর্থরাশি, ও তো সোনার ধূলা মাত্র—

দেবী গো, চাহি না, চাহি না, মণিময় ধূলিরাশি চাহি না,
তাহা লয়ে সুখী যারা হয় হোক, হয় হোক—
আমি দেবী, সে সুখ চাহি না!
যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এসো না এসো না,
এসো না এ দীনজন কুটীরে!
যে বীণা শুনেছি কানে, মন প্রাণ আছে ভোর,
আর কিছু চাহি না চাহি না!"

এই জিনিসটাই আসল। বাগ্‌দেবীর বীণা-নিক্কণে মনপ্রাণ ভরে না উঠলে সাহিত্যসৃষ্টি হয় না। সে সৃষ্টি হল ফুলের ফোটার মত স্বাভাবিক ও সুন্দর। "ফুল ফুটেছে এইটেই ফুলের চরম কথা। যার ভালো লাগলো সেই জিতল, ফুলের জিত তার আপন আবির্ভাবেই। সুন্দরের অন্তরে আছে একটি রসময় রহস্যময় আয়ত্তের অতীত সত্য, আমাদের অন্তরেরই সঙ্গে তার অনির্বচনীয় সম্বন্ধ। তার সম্পর্কে আমাদের আত্মচেতনা হয় মধুর, গভীর, উজ্জ্বল। আমাদের ভিতরের মানুষ বেড়ে ওঠে, রাঙিয়ে ওঠে. রসিয়ে ওঠে। আমাদের সত্তা যেন তার সঙ্গে রঙে রসে মিলে যায়—একেই বলে অনুরাগ।

কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা, ঔদাসীন্য থেকে উদ্বোধিত করা। সেই কবিকেই মানুষ বড়ো বলে, যে এমন সকল বিষয়ে মানুষের চিত্তকে আশ্লিষ্ট করেছে

যার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, মুক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর।....”

আমরা শ্রেষ্ঠ কবির কাছে বৈচিত্র্য ছাড়া আরো কিছু চাই, সেই জিনিসটার কথা কবি-শিল্পী আভাসে বলেছেন,—“কবির কাব্যেও সুরের অসংখ্য বৈচিত্র্য। সবই যে উদাত্ত ধ্বনির হওয়া চাই এমন কথা বলিনে। কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কিছু থাকা চাই, যার ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে —যা অনুরাগকেই বীর্যবান ও বিশুদ্ধ করে। ভর্তৃহরির কাব্যে দেখি ভোগের মানুষ আপন সুর পেয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গেই কাব্যের গভীরের মধ্যে বসে আছে ত্যাগের মানুষ আপন একতারা নিয়ে—এই দুই সুরের সমবায়েই রসের ওজন ঠিক থাকে, কাব্যেও মানবজীবনেও।”

সাহিত্যের বিষয় স্পষ্ট করে, আরও স্পষ্ট করে, বলা কঠিন। এর অনেক কথাই নিজেকে ভেবে সিদ্ধান্তে যাবার চেষ্টা করতে হয়। চর্চার সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতি বাড়ে; মহাজনদের শাস্ত্রপাঠ, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ লেখকের মন্তব্যপাঠ, আমাদের নিজ নিজ অনুভূতিকে আরও স্পষ্ট, আরও তীব্র, আরও উজ্জ্বল করে তোলে। ওই হল তাদের দাম।

পঠনীয়ঃ রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্য
অতুলচন্দ্র গুপ্ত—কাব্যজিজ্ঞাসা
শশিভূষণ দাসগুপ্ত—সাহিত্যের স্বরূপ

২

বিশ্ববিদ্যালয় যখন পাঠ্যবিষয় নির্বাচন করে ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটা বিলি ব্যবস্থা করে দেন, তখন একথা মনে করা সঙ্গত যে বিশেষ চিন্তা করেই তাঁরা সেকাজে হাত দিয়ে থাকেন। কারণ তাঁদের হস্তক্ষেপের ফলে বহু বালকবালিকার শিক্ষা বিশেষ বিশেষরূপ পেতে পারে। পাটীগণিত কিংবা ভূগোল কিংবা ইতিহাস যদি বিদ্যালয়ে শেখান না হয় তাহলে ফলটা যে কেমন দাঁড়ায় তা কল্পনা করা কঠিন নয়। ঐসব বিষয়ের উপযোগিতা সম্বন্ধে আমাদের মনে যাহোক একটা ধারণা আছে। ওদের ফল জীবনে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু সংস্কৃত কেন ইস্কুলে পড়ান হয়? এ একটা প্রশ্ন বটে। আমাদের হিসাব-কিতাব শেখার পক্ষে সংস্কৃত পড়ার কোনও দরকার নেই, আধুনিক জগতের অধিবাসী হওয়ার পক্ষে ভারতের সাধারণ শাসনপ্রণালী কি অনুরূপ বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই, কিন্তু সংস্কৃত শিখে ইহকালের কোনও সুবিধার কথা আমরা ভেবে পাই না। তাই যতদিন জোর করে সংস্কৃত শেখান হয়, ততদিন আমরা শিখি একরকম; ফাঁক পেলেই আমাদের চাড় যায় কমে, উৎসাহ যায় উবে। ম্যাট্রিক হতে বি. এ পর্যন্ত পাঠক্রম একবার দেখলে ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ও অনুপাতের হিসাব করলে একথার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। অথচ দুচার জনের মত আমারও মনে হয়, সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষার এখনও দরকার রয়েছে। আমাদের

দেশের, যাঁরা শুধু সাহিত্য পড়বেন তাঁদের নয়, যাঁরা আমাদের দেশের ভাল করতে চান, তাঁদের পক্ষেও সংস্কৃত সাহিত্য শেখা বা তার সঙ্গে একটা পরিচয় রাখা অত্যাবশ্যক বলে মনে করি। তাই আমাদের বিষয়-প্রসংগ অনুসারে বাংলাসাহিত্যের খসড়ার কথা বলতে গিয়ে সাহিত্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ সাধারণ আলোচনার পরই সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলবার প্রয়াসী হয়েছি।

সংস্কৃত ভাষাকে বলা হয় দেবভাষা, ইংরেজিতে আমরা একটু রকমফের করে বলে থাকি—dead language ; যাঁরা এই দুই শব্দ প্রয়োগ করে থাকেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র এই ভাষায়, সার্বভৌম ধর্মশাস্ত্র এই ভাষায়, তাই এ ভাষা হল বিশেষ করে ধর্মের ভাষা ; হিন্দুর দশবিধ সংস্কারে আজ পর্যন্ত এই ভাষাই চলে এসেছে, এর বঙ্গানুবাদ নয়। সুতরাং প্রাচীনপন্থীর কাছে, গীতাধ্যায়ীর কাছে, স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর কাছে, যাঁরা উপনিষদাদি হিন্দুজাতির মহামূল্য গ্রন্থ পড়েছেন তাঁদের কাছে এই ভাষার একটা মাহাত্ম্য, একটা বিশেষ অর্থ আছে। আর dead language কথাটা তাঁদের, যাঁদের মনে হয় ভাষার জীবনী শক্তি থাকে না, যদি লোকে চলতি জীবনে দিনরাতের প্রয়োজনে সেই ভাষা ব্যবহার বা প্রয়োগ না করে ; যে ভাষায় যত বেশি লোক কথাবার্তা বলে, সেই ভাষা তত বেশি জীবন্ত। এই দুইয়ের কোনও অর্থই কিন্তু আমরা বর্ত্তমান প্রসংগে গ্রহণ করতে পারছি না। সংস্কৃত ভাষার এই জন্যই গৌরব করি যে, ভারতের

গৌরবময় যুগে লোকে এই ভাষায় তাঁদের উদার ভাবনা লিপি-বদ্ধ করে গেছেন। সংস্কৃত ভাষার এই জন্য গৌরব করি যে, এতদিন পরেও ও ভাষার একটা নিজস্ব শক্তি আছে, গাম্ভীর্য চটুলতা ইত্যাদি মনের নানা বিচিত্র ভাব প্রকাশ করতে ও এখনও পটীয়সী ; সুতরাং 'মরা ভাষা' বলে মেনে নিতে মন কিছুতেই চায় না, আর তার কোন কারণও নেই। তাই আমরা সংস্কৃত ভাষার অপূর্ব জীবনী শক্তির কথা বলি, যাঁরা ও ভাষায় অপূর্ব রচনা নিবদ্ধ করে গেছেন তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হতে চাই, তাঁদের সাহিত্য ঐ ভাষায় নিবদ্ধ বলে সে সাহিত্যের প্রকৃতিও যে ঐ ভাষার প্রকৃতি খানিকটা পেয়েছে। পাবেই তো ; 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ' ভাষা ও সাহিত্য। ভাষা ও সাহিত্য যে বাক্ ও অর্থের মতই নিবিড়ভাবে সম্বদ্ধ।

বাংলা সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের কথা যে একটু বলে নিতে চাই, তা নিতান্ত খামখেয়ালি ভাবে নয়। কৈশোর হতেই নানাভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির সঙ্গে মতামতের বিনিময়ের ফলে একটা জিনিস দেখে বড়ই আশ্চর্য বোধ করেছি যে, নরম চরম গরম সর্ববিধ মেজাজের লোকের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি একটা দরদের পরিচয় পাওয়া যায়। একজনের কথা বলি, তিনি দীর্ঘকাল সরকারি চাকুরি করে তা হতে অবসর গ্রহণের পর বিস্তৃত জমিদারি পরিদর্শনের কাজে জীবন কাটিয়ে জীবনের সায়াহ্নে উপনীত ; তিনি প্রগতিবাদী জাতীয়তায় উৎসাহী নন, কিন্তু ভারতের সত্য

শিব সুন্দরের সাধনায় উৎসাহদাতা ; তাঁর দৃঢ় ধারণা, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি না হলে দেশের উন্নতি হবে না। তিনি নিজে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ভাল জানেন, তার চর্চা ভালবাসেন ; তাই ভাবলাম, এ বুঝি একদেশদর্শীর কথা। কিন্তু আমার চমক লেগেছিল, যেদিন প্রগতিবাদী জাতীয়ভাবে ভরপুর কোনও দৈনিক পত্রের সম্পাদকের কাছে ঐ একই মতের পোষকতা পেলাম। মনে পড়ল, একদিন যিনি ইউরোপের বৈদগ্ধ্যের শীর্ষে ছিলেন সেই মহামতি গেটেকে। কি উচ্ছ্বসিত ভাবেই না তিনি শকুন্তলার কথা বলে গেছেন—তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য ভারতের এই অপূর্ব সৌন্দর্যসৃষ্টির চরণে নিবেদন করেছেন!* সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ভারতের আপামর জনসাধারণের পরিচয় ঘটুক, এমন দাবি করি না, তা অসম্ভব ; কিন্তু আজকার দিনে যাঁরা ভারতের অতীত গৌরবের স্মৃতি দেশের বুকে জাগিয়ে তুলতে চান, সেই চিন্তানায়কদের নিকটে কি সবিনয়ে নিবেদন করতে পারি না যে, দেশের ঠাকুরকে ফেলে বিদেশের

*Wouldst thou the young year's blossoms
And the fruits of its decline ;
Aud all by which the soul is charmed,
Enraptured, feasted, fed ;
Wouldst thou the earth and heaven itself
In one sole name combine———
I name thee, O Sakuntala,
And all at once is said.

কুকুরের আদর সম্বন্ধে বাংলার হাস্যরসিক কবি যে মন্তব্য করে গেছেন আমরা এখনও তার চৌহদ্দি পার হতে পারিনি? বর্তমান প্রসংগে এ বিষয়ের আলোচনা যদিও আভাসেই হওয়া সম্ভব, তবু অতীতগৌরববাহিনী বাণীর নিকটে আমার প্রণতি না জানিয়ে, বিষয়টির গুরুত্বের কথা উল্লেখ না করে, পারি না।

নিঃসঙ্গ বা নির্জন অবস্থায় পড়ে সময় কাটাবার উপাদান বইয়ের জন্য হাহাকার করাই স্বাভাবিক। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের প্রয়োজনও এক এক প্রকারের হয়ে থাকে। আমার একজন বন্ধুর ঘুমোতে যাওয়ার আগে রোজ একখানা বাংলা বইয়ের দরকার হত—বেশি দূরে এগোবার প্রশ্ন তাঁর ছিল না, জোরে জোরে পড়তে পড়তে নিজেরই পড়ার শব্দে মুগ্ধ হয়ে দশ বিশ মিনিটের মধ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। কিন্তু ঘুমপাড়ানি হিসাবে ছাড়া যাঁরা বাস্তবিকই বইয়ের অর্থও বুঝতে চান, তাঁদের কেউ কেউ সমাজনীতির আকর্ষণীতে বাঁধা পড়েন, কেউ কেউ ভক্তিরসে হাবুডুবু খান, কেউ বা ডিটেকটিভ গল্পের মধুর আস্বাদ উপভোগ করেন। অনেকে কোমর বেঁধে উর্দু শিখতে লেগে যান। কাব্যলক্ষ্মী যাঁদের প্রতি একান্ত বিমুখ নন, তাঁদের জন্য একটা প্রশস্ত পথ খোলা আছে; তাঁরা কাব্যসাগরে ডুব দিন। রবীন্দ্রসাহিত্যের কাকলীতে বাংলা দেশ আজ মুখর। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের শুধু যে ধার আছে তা নয়, তার ভারও যথেষ্ট; তাঁরা এই রবীন্দ্র-কাব্যের পরিচয় লাভ করুন। এর ক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে

বলার নয়। আমাদের গৌরব যে, আমরা রবীন্দ্র যুগে জন্মেছি; কিন্তু সেই গৌরব দাঁড়াবে অগৌরবে, যদি রবীন্দ্র সাহিত্যে আমরা—বিশেষ করে বাঙ্গালীরা—উদাসীন থাকি। সঙ্গে সঙ্গে আর একখানি বইয়ের কথা আমার মনে পড়ে—ইংরেজ কবি শেকসপীয়রের নাটক। জগতের সংস্কৃতির মধ্যে শেকসপীয়রের স্থান কোথায় তা বলে এখানে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই, কিন্তু শুধু শেকসপীয়র পড়লেই যে ইংরেজি ভাষা শেখার কষ্ট সার্থক হবে, সে কথা মনে রাখা দরকার। এই দুইখানির সংগে আমি তৃতীয় একখানি জুড়ে দিতে চাই—কালিদাসের গ্রন্থাবলী। ভারতের গৌরব কালিদাস; আমরা যদি পারি তো এই গৌরবকে অভিনন্দন করে ভারতের মর্যাদা স্বীকার করব না কেন? কালিদাসকে বাদ দিলে ভারতের গৌরবের অনেকখানি যে কমে যায়! নির্জনবাসে এই ত্রয়ীকে সঙ্গী করলে সময় মন্দ কাটবে না, হয়তো মনের খোরাক মোটের ওপর ভালই পাওয়া যাবে—চিত্তবিক্ষেপকারী অনাবশ্যক পুস্তকের বোঝা বাড়াবার সুবিধা যখন হবে না।

কালিদাসের কাব্য সম্বন্ধে কিছু বলার আগে আমি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের দুইটি দিক উল্লেখ করতে চাই। প্রথম, কাব্যের ছন্দ। বাংলা ও ইংরেজি কবিতার ছন্দের সঙ্গে আমাদের অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। দেখছি, কোথাও কড়াকড়ি করবার জো নাই। বাংলা পয়ার চৌদ্দ অক্ষরের হলেও মাঝে মাঝে পনের ষোল অক্ষরও মানিয়ে নিতে পারি, স্বর টেনে বাড়ানো বা

নামানো যেতে পারে। ইংরেজি কবিতাতে দেখেছি, একটু rigour বা কঠোরতা হলে সব গোলমাল হয়ে যায় ; ছন্দ যেন হয় যাকে বলে wooden—নীরস শুকনো কাঠের মত গতি হয় তার। কবি লংফেলোর Tell me not in mournful numbers মনে করুন ; তার প্রথম চরণ ও চতুর্থ চরণ (দুই-ই প্রথম স্তবকের) তুলনা করুন। দেখবেন যে ট্রকি ও আয়াম্বিক পর পর একভাবে নাই ; একটানা ট্রকি ও আয়াম্বিক পড়লে হাঁপিয়ে পড়তে হয়। ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা অনুমোদন করাই আছে। কিন্তু সংস্কৃত ছন্দে ওসব ব্যতিক্রম কিছুতেই চলে না ; ছন্দের নিয়ম যা ছকে দেওয়া গেছে, তা মেনে চলতেই হবে। যাতে একঘেয়ে না হয় সেজন্য মহাকাব্যে ব্যবস্থা আছে—বিভিন্ন সর্গে বিভিন্ন ছন্দের প্রবর্তন, একই সর্গে শেষের ভাগে নূতন ছন্দের প্রয়োগ, ইত্যাদি। কিন্তু তাই বলে মন্দাক্রান্তার মধ্যে এক আধ জায়গায় এক আধটুকু অদল বদল করলে কবিও রাজি হবেন না, পাঠকও মানবেন না। জবাবদিহির ভয় অত্যন্ত ও উভয়তঃ। এই কঠোরতা সত্ত্বেও ছন্দ একঘেয়ে হয় না, এইটেই আশ্চর্য। ছন্দের মধ্যে শব্দের মধ্যে এমন একটা সরসতা আছে যা তাকে বাঁচিয়ে রাখে, জীবন্ত করে রাখে। সংস্কৃত সাহিত্যের এই দিকটা—ছন্দের মাধুর্য ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটা—যদি একটু মনে রাখা যায়, তা হলে অনুভব করতে পারব যে এ বিষয়ে শিখবার জন্য আমাদের বাইরে যেতে হবে না, আমাদের প্রাচীন ভাষায় ছন্দের যে সম্পদ আছে তা

প্রচুর, ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, প্রয়োজন আমাদের তরফ থেকে সে বোধকে জাগ্রত করে রাখবার, যাতে তার দিকে আমাদের চোখ অথবা কান থাকে। আমাদের কর্মময় ও ভাবময় সকল সংসারেই যথেষ্ট ত্রুটি আছে; পূর্ণতা কোথায় কোথায় আছে তা-ও দেখা দরকার, সম্যক্ বা শুদ্ধ দৃষ্টি লাভ করবার জন্য।

আর হল, সংস্কৃতের আশ্চর্য ধ্বনিসম্পদ। ধ্বনির সঙ্গে ছন্দের অবশ্য একটা যোগ আছে, কিন্তু এ সম্পদ যা বলছি তা হল সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। ইংরেজির ধ্বনিসম্পদের উদাহরণ দিতে হলে, মনে হয় মিলটনের কথা। তাঁর মহাকাব্যে, তাঁর লিসিডাসে, তাঁর কোমাসে, কাব্য মাঝে মাঝে যেন শব্দের দ্বারাই নিজের অন্তর্নিহিত ভাব উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছে। অর্থের অপেক্ষা সে রাখেনি। মিলটনের দুই শ বছর পরে টেনিসনও তাঁর কবিতায় প্রাক্তন মহাকবির বন্দনা করতে গিয়ে সেই তরঙ্গায়িত ধ্বনির সৃষ্টি করেছেন—

O mighty-mouthed inventor of harmonies,
O skilled to sing of Time or Eternity,
God-gifted organ voice of England,
Milton, a name to resound for ages—

আমাদের কবি শ্রীমধুসূদন তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যে ঠিক এই ভাবেই ধ্বনির সৌন্দর্য ও ঔদার্য ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যে এই সম্পদ বহুস্থানে (কোথাও অস্থানে নয়) বিকীর্ণ আছে। প্রাচীনদের কাছে এ জিনিসটাও

আমাদের শিখবার ; শুধু বড় কথা নয়, শুধু যুক্তাক্ষর নয়, কৌশল চাই, এবং সে কৌশল সংস্কৃতে যত সম্ভব আর কোথাও তেমনটি কি না সন্দেহ। ধ্বনির গুণে সৌন্দর্যই একমাত্র ব্যক্ত হয় তা নয়, ঔদার্য—একটা বড় কথা যে বলা হচ্ছে, কথার মধ্যে যে ভাবের ঠাসবুনানি আছে, এবং সেই ঠাসবুনানি যে পাঠক ও শ্রোতাকে তখন তখন ঊর্ধ্বে উঠিয়ে দেয়—সেই ঔদার্য ও ধ্বনির গুণে ভাষার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিমবাবুর আবির্ভাব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি কথা বলে গেছেন, সংস্কৃত ভাষা থেকে নিয়েই বলেছেন, সেই কথাটি, আমার মনে হয়, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের কৌলীন্য, তার মর্যাদা, তার গাম্ভীর্য, তার ঔদার্যকে প্রকাশিত করে—"সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনির্।' এই অপূর্ব ধ্বনিসম্পদ ও অপূর্ব ছন্দসম্পদ থাকাতেই বুঝি সংস্কৃত ভাষা দেবভাষা নামে সার্থক হয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্য বলতে আমি মুখ্যতঃ কালিদাসের কথাই বলব। তার কারণ, কালিদাস কবিশ্রেষ্ঠ।

পুরানো সংস্কৃত শ্লোক বলে—

> পুষ্পেষু জাতী পুরুষেষু বিষ্ণুঃ নারীষু রম্ভা নদীষু গঙ্গা।
> নৃপেষু রামঃ অধ্বরেষু সোমঃ কাব্যেষু মাঘঃ কবিকালিদাসঃ॥

'দেশ জয় করতে হলে রাজধানী জয় করলেই চলে'—এই প্রসঙ্গে আমার জনৈক বন্ধু বলেছিলেন ; সেই নজিরের জোরে বলি, কালিদাসকে পড়লেই সংস্কৃত সাহিত্যের পরিচয় লাভ করা হল বলা চলে।

কালিদাস কোন সময়কার লোক, কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ। বিক্রমাদিত্য ও তাঁর সময় নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনেকে ঘোরতর আলোচনা করেছেন। বর্তমান ক্ষেত্র সে আলোচনার উপযুক্ত নয়, আমরা রসাস্বাদনের জন্যই ব্যস্ত! কবির চারটি রচনার উল্লেখমাত্র করব—রঘুবংশ, মেঘদূত, অভিজ্ঞানশকুন্তল, কুমার-সম্ভব। আমাদের আলোচনা এই চারটি কাব্যে আবদ্ধ থাকবে।

শুনতে পাই, চতুষ্পাঠীতে এই নিয়ে এক কালে হাসি ঠাট্টা হত—রঘুরপি· কাব্যং ; যদি এর অর্থ হয় যে 'রঘু অতি সহজে বোঝা যায়' তাতে আমার কোন আপত্তি নাই ; কিন্তু চাতুর্যের অভাব মানেই তো আর কাব্যশক্তির অভাব নয়! রঘুর ঘটনা-পরম্পরা বড় কম নয় ; দিলীপ থেকে আরম্ভ করে অগ্নিবেশ পর্যন্ত—মনে হয়, এ তো কাব্য নয়, এ যে chronicle—একেবারে ইতিহাসের সঙ্গে পাল্লা দিতে আরম্ভ করেছে! সাধারণতঃ দিলীপ থেকে রাম পর্যন্তই অবশ্য পড়া ও পড়ান হয়, কিন্তু তাতেও ঘটনার পর ঘটনা, দ্রুত পট পরিবর্তন, বিচিত্র ও বিভিন্ন রসের আস্বাদ—কোথায় থামি, আর কোথায় আরম্ভ করি! তবু মহাকবির বর্ণনাশক্তি এত সুন্দর ও তাঁর রেখাগুলি এত স্পষ্ট যে ঘটনার বাহুল্য কোথাও পীড়া দেয় না, কোথাও ভিড় করে না। শ্লোকের বাঁধুনি এত মজবুৎ যে তার গতি ও শক্তি পাঠককে শ্লোক হতে শ্লোকান্তরে অবলীলাক্রমে নিয়ে যায়। আরম্ভ করি যখন, তখন পড়ি রাজা দিলীপের চরিত্রবর্ণনা—

সেনা পরিচ্ছদস্তস্য দ্বয়মেবার্থসাধনম্।
শাস্ত্রেষ্বকুণ্ঠিতা বুদ্ধি র্মৌর্বী ধনুষি চাততা॥
তস্য সংবৃতমন্ত্রস্য গূঢ়াকারেঙ্গিতস্য চ।
ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব॥

আবার জুগোপাত্মানমত্রস্তো ভেজে ধর্মমনাতুরঃ।
অগৃধ্নুরাদদে সোঽর্থমসক্তঃ সুখমন্বভূৎ॥
জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্যয়ঃ।
গুণা গুণানুবন্ধিত্বাত্তস্য সপ্রসবা ইব॥

কথাগুলির মধ্যে এমন একটা গম্ভীর ভাব আছে যা মনকে উদাত্তসুরে বেঁধে দেয়। মহাকাব্যের মহত্ত্ব মন অতি সহজেই মেনে নেয়, অলংকারশাস্ত্রের সঙ্গে সব বিষয়ে মিলে যাচ্ছে কি না সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন করে না। এই গাম্ভীর্যের সঙ্গে মিশেছে এক অপূর্ব সংযম। মহাকবি প্রথম থেকেই সংযমের কথা নানা ছন্দে বলেছেন; কোথাও বলেছেন রাজাপ্রজায় মিলেজুলে এই সংযম রক্ষার বিষয়ে—

রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদা মনো র্বর্ত্মনঃ পরম্।
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ॥

কবি যেন কৌশলে বলে দিচ্ছেন, রাজাপ্রজা উভয়ে সংযম রক্ষা না করলে সংযম গুণটিই গৌরবের হয় না, নানা দোষ এসে তাতে প্রবেশ করে। আবার কোথাও বলছেন দিলীপের

ব্রতকথা—সেখানেও লক্ষ্য করি কবির শব্দ দিয়ে ছবি আঁকবার ক্ষমতা—

লতাপ্রতানোদ্‌গ্রথিতৈঃ স কেশৈঃ
অধিজ্যধন্বা বিচচার দাবম্।
রক্ষোপদেশা ন্মুনিহোমধেনোর্
বন্যান্ বিনেষ্যন্নিব দুষ্টসত্ত্বান্॥

কথাগুলির মধ্যে এমন কিছু কল্পনার কারিগরি নাই, কিন্তু বলতে বাধা নাই—রঘুবংশের যে কয়টি শ্লোক আমি ভুলি নাই তাদের মধ্যে এটি হল একটি। মনে পড়ে, পুণ্য সূর্যবংশে জাত দিলীপ, প্রতাপবান নরপতি হয়েও তপস্বী বেশে মুনির হোমধেনু রক্ষার জন্য স্থানকালোচিত মত বেশ পরিবর্তন করে বনের মধ্যে তার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যেখানে রাজার পরীক্ষা হচ্ছে সিংহের কাছে, সেই জায়গাটা, সেই কথা কাড়াকাড়ি, তাই বা কি চমৎকার!

একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুশ্চ।
অল্পস্য হেতো র্বহু হাতুমিচ্ছন্ বিচারমূঢ়ঃ প্রতিভাসি মে ত্বম্॥

কথা কয়টি আজও মূল্যবান, আজও এরা পুরান হয়ে যায় নাই। যেখানে আদর্শের জন্য সাংসারিক বিচারে যা অমূল্য তাও ছেড়ে আসতে হয়, সেখানে মনে পড়ে এই শ্লোকটির কথা। একটি মাত্র ধেনুর জন্য দিলীপ তাঁর প্রাণ বিসর্জন দিতে এগিয়ে গিয়েছিলেন, শুধু সংযম নয়, প্রচণ্ড শক্তি, ত্যাগের শক্তিও তাঁর ছিল, এবং তাঁর মধ্যে কোনও পাটওয়ারি বুদ্ধি এসে জোটে নি। সমস্ত প্রসঙ্গটাই যে মনে রাখবার মত।

রঘুর মধ্যে বহু শ্লোক আছে যা স্বাদু য' উপাদেয়, যা হিতকর, যা কল্পনাকে ঘা দিয়ে সুন্দরকে উপলব্ধি করার পথ সহজ করে দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি বলি, রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে যখন লঙ্কা হতে অযোধ্যায় ফিরে যাচ্ছেন, তখন সমুদ্রের ওপর দিয়ে যেতে যেতে তিনি যে ভাবে বর্ণনা করে গেছেন—সেই যে নদীর মোহানায় "পিবত্যসৌ পায়য়তে চ সিন্ধুঃ"—সেই যে পাড়ের কাছে "তমালতালবনরাজিনীলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলংকরেখা"—সেই বিমানযাত্রার কথাও আজও, এই এয়ারোপ্লেনের যুগেও, মনকে টানে।

রঘুর সম্বন্ধে এটুকু বলেই ক্ষান্ত হব; আর দুটো জায়গা আছে, তাদের কথা পরে বলা যাবে। কুমারসম্ভবের দুটো জায়গা সকলেরই খুব মনে পড়বে—এক হল ধ্যানী মহাদেবের ছবি, আর হচ্ছে তাপসী উমা যেখানে ব্রাহ্মণবেশী শিবের কাছে শিবনিন্দা শুনে বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরাচ্ছেন। প্রথমটির বর্ণনা—

পর্যংকবন্ধস্থিরপূর্বকায় মৃজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংসম্।
উত্তানপাণিদ্বয়সন্নিবেশাৎ প্রফুল্লরাজীবমিবাংকমধ্যে ॥
ভুজংগমোন্নদ্ধজটাকলাপং কর্ণাবসক্তদ্বিগুণাক্ষসূত্রম্।
কণ্ঠপ্রভাসঙ্গবিশেষনীলং কৃষ্ণত্বচং গ্রন্থিমতীং দধানম্ ॥
কিঞ্চিৎপ্রকাশস্তিমিতোগ্রতারৈঃ ভ্রূবিক্রিয়ায়াং বিরতপ্রসঙ্গৈঃ।
নেত্রৈরবিস্পন্দিতপক্ষ্মমালৈঃ লক্ষ্যীকৃতঘ্রাণ মধোময়ূখৈঃ ॥
অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরংগং।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্ ॥

কপালনেত্রান্তরলব্ধমার্গৈঃ জ্যোতিঃপ্ররোহৈ রুদিতৈঃ শিরস্তঃ।
মৃণালসূত্রাধিকসৌকুমার্যং বালস্য লক্ষ্মীং গ্লপয়ন্তমিন্দোঃ॥
মনো নবদ্বারনিষিদ্ধবৃত্তি হৃদি ব্যবস্থাপ্য সমাধিবশ্যম্ ;
যমক্ষরং ক্ষেত্রবিদো বিদুস্তমাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্ ॥

এই গম্ভীর বর্ণনা দ্বারা কালিদাস সমস্ত কাব্যখানিকে এত উত্তান ভূমিতে আরূঢ় করিয়েছেন যে, কথায় তা বর্ণনা করা যায় না, কথা যেন সেখানে গিয়ে শেষ হয়। তার পরের ঘটনায় পরিণতির কথা, সকলে অবগত আছেন।

উমার তপস্যার কথাও এখানে সবিস্তরে বর্ণনা করে দরকার নাই। দুটো বর্ণনায়—এটায় ও সেটায়—প্রকারগত ভেদ নাই। কিন্তু স্বয়ং শিব যেখানে ব্রাহ্মণবেশে এসে উমার মন বুঝবার জন্য তাঁর কাছে শিবনিন্দা করছেন, সেখানে তর্কবিতর্কের পর পার্বতী চটে গিয়ে সখীকে বলছেন—

নিবার্যতামালি কিমপ্যয়ং বটুঃ পুনর্বিবক্ষুঃ স্ফুরিতোত্তরাধরঃ।
ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্ ॥

কিন্তু যেই উমা রাগ করে চলে যাবেন, অমনি শিব নিজমূর্তি ধারণ করে সামনে এসে দাঁড়ালেন—তাঁর পথ রোধ করে।

কুমারসম্ভবের এই দুটি ছবি—হর ও গৌরীর, অথবা হর ও হরগৌরীর—পাঠকের মনে থেকে যায়, ও চিরকাল ধরে আনন্দ দেয়।

মেঘদূত পাঠকের সামনে এনে দেয় উত্তর ভারতের এক

বিবিধধ্বনিমুখর অপরূপ ছবি। বিন্ধ্যপাদে উপলবিষমা বিশীর্ণা রেবা, দশার্ণ জনপদ, বেত্রবতীর তীরে বিদিশানগরী, উজ্জয়িনীর সৌধাবলী, উদয়নকথামুখরগ্রামবহুল অবন্তী, শিপ্রাতীরে বিশালা পুরী, তীর্থীভূত দেবগিরি, চর্মণ্বতী নদী, রন্তিদেবের দশপুর নগর, ব্রহ্মাবর্ত জনপদ, গঙ্গাতীরবর্তী কনখল— মানসপটে এঁকে দেয় অধুনাবিস্মৃতপ্রায় অতীত ভারতের এক ছায়াময়ী মূর্তি। আমাদের চক্ষু আজ হয়তো অতীতের দিকে আর ফিরেও চায় না, ভবিষ্যতেই নিবদ্ধ বেশি, তবু মেঘদূতের রস আস্বাদন করতে গেলে চোখের ওপর যে ছবি ভাসে. তা বর্তমান বা ভবিষ্যতের ভারত নয়, তা হল গিয়ে অতীতের ভারত, এবং সে ভারতের মধ্যে সঞ্চিত আছে অশেষ গৌরব, বিপুল সৌন্দর্য। মন্দাক্রান্তা ছন্দের যে নিজস্ব একটা সৌন্দর্য আছে, যা কি না প্রাণ দিল মেঘদূতকে এক মধুমাখা অভিনব উপায়ে, তার উল্লেখ করে মেঘদূতের আলোচনা শেষ করি।

কালিদাসের অমরকৃতি অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের উল্লেখ পূর্বেই সগৌরবে করেছি। কিন্তু তার যে মূল্য, তা কি আমরা এক আধ ঘণ্টার আলোচনায় নির্ধারণ করতে পারি! তা সম্ভব হবে শুধু তখনই, যখন আমরা নাটকটি আদ্যোপান্ত পড়তে রাজি হব। এর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সোনার সুতোয় গাঁথা। অমর কবিদের দু একটি ছবি—দু একটি মাত্র—সকল কাল সকল দেশকে ছাপিয়ে প্রতিভার জ্যোতি বিকীরণ করতে থাকে; শেকসপীয়রের মিরাণ্ডা যেমন, শকুন্তলা ঐ ধরণের সৃষ্টি। সর্বদা

সব জায়গায় তার তুলনা মেলে না। তপোবনে আজন্মবর্ধিতা শকুন্তলার প্রেম—কোনও খাদই তাতে নাই। রাজার স্বভাবে বা পূর্বজীবনে বিলাসের যে নর্মলীলা ছিল, তাও যেন গোপনে রয়েছে, কবিতার ফ্রেমে ঈষৎ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে মাত্র। দুর্দৈবে সে প্রণয়ের বিস্মৃতি; রাজসভায় সর্বসমক্ষে তপোবনের আশীর্বাদমত পাওয়া শকুন্তলাকে রাজা মায়ামুগ্ধ হয়ে প্রত্যাখ্যানই করলেন। কিন্তু অভিনব অভিজ্ঞানের কৌশলে কিছুকাল পরে তাঁর মনে পড়ে গেল অতীতের কথা। কোথায় তখন শকুন্তলা! পুনর্মিলনের কোনই আশা নাই! তাই বলে সেকালকার রাজারাও—সাধারণ লোকের কথা না হয় ছেড়ে দিই—কর্তব্যে ফাঁকি দিতে পারতেন না। দেবতার অনুগ্রহে রাজার সঙ্গে সপুত্র শকুন্তলার দেখা হল—সে পুত্রের নাম ভরত, যাঁর নাম থেকে আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ। নাটক আরম্ভ হয়েছিল অষ্টমূর্তিধর ভগবানের স্তুতি দিয়ে, শেষ হল ত্রিধারা এক প্রার্থনা নিয়ে,—রাজাগণ প্রজাদের হিতে প্রবৃত্ত হন, সমাজে বাগ্‌দেবীর আদর বাড়ুক, আর 'আমার' অর্থাৎ কবির, অথবা নটবিশেষের মোক্ষলাভ হক। সাহিত্যরচনায় সমাজকে যে মোটেই উপেক্ষা করা হত না, বরং সাহিত্যের সঙ্গে সামাজিক দিকটা যে কি ভাবে মিলে মিশে গিয়েছিল, সেটা লক্ষ্য করবার বিষয়। নাটকখানির মধ্যে পবিত্র প্রেমের এমন একটা কাহিনী রয়েছে যে হাসিঠাট্টা ও লঘু আলোচনা করে তার লাঘব করা যায় না।

রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের এই অতি সামান্য পরিচয়ে রসিক পাঠকের মন অবশ্য তুষ্ট হবে না। তাঁদের জন্য চাই মূলপুস্তকগুলি পাঠ; বাংলা অনুবাদের সাহায্যে তাঁদের মূলে প্রবেশ লাভ হতে পারে। কিন্তু কবির দৃষ্টিভঙ্গী, মানবচরিত্রের অনুধ্যান, আর জগতে অশুভ কোথা হতে আসে—এ সব বিষয়ে তাঁর মন্তব্য, সবই লক্ষণীয়। যে কবি মিলনের কথা সম্ভোগের কথা বহু বিচিত্রভাবে বলে গেছেন, তিনি যে বিরহেরও কবি, সব সময় হয়তো সে সমস্ত কথা মনে পড়ে না। কিন্তু রঘুবংশে অজবিলাপ, ও বনবাসে সীতার বিলাপ—যে দুই অংশের কথা বাদ রেখেছিলাম—কুমারসম্ভবের রতিবিলাপ, মেঘদূতে বিরহী যক্ষের আঁকা বিরহিণী প্রিয়ার ছবি, অভিজ্ঞানশকুন্তলে দুষ্যন্তবিরহিতা বিষাদমূর্তি তাপসীর বেশে শকুন্তলা-এদের সম্বন্ধে খানিক আলাপ-আলোচনার হয়তো এখনও অবকাশ আছে, ছন্দের দিক দিয়ে ভাবের দিক দিয়ে মানুষের ভাগ্যে দুঃখ কেন ঘটে তার কারণ সম্বন্ধে কবির ইঙ্গিতের দিক দিয়ে। একই বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে বিভিন্ন-প্রসঙ্গে প্রয়োজনমত বৈচিত্র্যের অভাব যে কালিদাসের হয়নি, আলোচনায় সে কথাও বোঝা যাবে। বহুদিন পরে এই প্রসঙ্গ-গুলি আবার পড়লাম, লাগল অতি সুন্দর; বিভিন্ন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যেন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। আজকার দিনে সেই আলোচনা লোভনীয় বটে, কিন্তু আজ তার অবসর নাই—পারি তো আর একদিন সে কাজ করা যাবে।

কালিদাস থেকে আমরা বহুদূর চলে এসেছি—হয়তো দুই হাজার বছরের কাছাকাছি। সংস্কৃত সাহিত্যের কাকলী কিন্তু নীরব হয় নি। তা সমানে জুগিয়েছে আমাদের আন্তর-জীবনের রসসম্ভার, লেপে দিয়েছে আমাদের দৃষ্টিতে এক অভিনব কজ্জল। ইংরেজি সাহিত্যের অধিকার আমাদের মনের মধ্যে পাকাপাকি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বৈদগ্ধ্যে সংস্কৃতের ছিল অকুণ্ঠিত প্রতিপত্তি; তখন কালিদাস-মাঘ-শ্রীহর্ষের রচনাকুশলতার কথা বাঙ্গালীকে বেশি বাক্যব্যয় করে বোঝাতে হত না। এমন কি, গত শতাব্দীর সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা করলে নিশ্চয়ই দেখা যাবে, বাঙ্গালী সংস্কৃতকে তো একেবারে অবহেলা করেই নি, শুধু আজকেই নানাপ্রকার কারণে পুরান ভাষা কোণঠাসা হয়ে পড়ে রয়েছে। একশ বছর আগে তাই ইংরেজি নাটকের অভিনয়ের নমুনা দেখাতে গিয়ে সংস্কৃত নাটকের অংশবিশেষও অভিনয় করতে হয়েছে, নইলে 'এমেচার' নটদের মনঃপূত হত না। প্রথম বাংলা শিক্ষার্থীর উপযুক্ত সাহিত্য পুস্তক লিখতে গিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই কারণেই অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ও উত্তরচরিতম্, কালিদাস ও ভবভূতির এই দুই উৎকৃষ্ট রচনা বাংলা পোষাক পরিয়ে শকুন্তলা ও সীতার বনবাস নামে পেশ করতে হল। এ যে একেবারে সাক্ষাৎসম্বন্ধ! জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অক্লান্ত অনুবাদচেষ্টা সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বাংলার এই যোগ আজকার দিনেও অক্ষুন্ন রাখতে চেয়েছে; কাদম্বরীর ঐশ্বর্যময়ী রীতিও

বাংলার গদ্য লেখকেরা অভিনব রচনা-শৈলী হিসাবে একেবারে ভুলে যান নি। মেঘদূতের বহু অনুবাদ প্রাচীনের সঙ্গে নতুনের সম্বন্ধকে একেবারে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

বাংলাভাষার নিজস্ব রীতি, বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব ধারা—এ সব কথা অবশ্যই মানতে হবে ; কিন্তু তাই বলে সংস্কৃতের দান আমরা ভুলতে পারব না, আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে সংস্কৃতের দাগ থাকবে, এ কথাও আজ নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে—এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ। গত শত বৎসর ধরে যাঁরা আমাদের সাহিত্যের কর্ণধার হয়ে তাকে বিপদসংকুল আবর্তের মধ্যে দিয়ে নিয়ে এসেছেন, তাঁদের দৃষ্টি ও চেষ্টা ছিল সংস্কৃতমুখী। অবশ্য, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যেমন সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি ইংরেজি সাহিত্যেও তাঁদের জ্ঞান ছিল প্রচুর। তাঁদের দৃষ্টির উদারতা ছিল, সঙ্গে সঙ্গে স্বধর্মবোধও জাগ্রত ছিল। ভারতকে বাংলাকে বাঁচতে হলে বাইরের জিনিস নিতেও হবে, আবার অতীত থেকেও রস আহরণ করতে হবে। অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমানও নয়, ভবিষ্যৎও নয়। সংস্কৃত সাহিত্য ভুললে যে বাংলার সাহিত্যিকের চলবে না, নিজেদের আচরণ দিয়ে ও দৃষ্টিভঙ্গীর ইঙ্গিতে তাঁরা সে কথা যেন বলেই গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের উচ্চাংগ সমালোচনাও উভয়ের কাছ থেকে পেয়েছি। 'কাব্যে উপেক্ষিতা,' আর শুধু 'কাব্যে উপেক্ষিতা' কেন সমগ্র 'প্রাচীন সাহিত্য'ই যে এবিষয়ের একটা দিগ্‌দর্শন।

শুধু প্রবন্ধে নয়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও যত্র তত্র কালিদাসের পটভূমিকা চোখে পড়ে। "আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে—" এ হেন কবিতা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসঙ্গগুলি জানা থাকলে তবেই উপভোগ্য, একথা এখানে বলা চলতে পারে। কবিগুরুর 'স্বপ্ন', 'দূরে—বহু দূরে' ইত্যাদি অন্য অনেক কবিতায় এ মন্তব্যের পোষকতা পাওয়া যায়। শেষ-বর্ষণের একটি গানের কথা এখানে স্মরণ করি—

কেতকী কেশরে কেশপাশ কর সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কংকণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গনিয়া গনিয়া
স্মিত বিকসিত বয়নে,
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল-শয়নে ॥

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সকলেই বলে গেছেন, পাশ্চাত্যের সঙ্গে আমাদের শুধু নেওয়ার সম্পর্ক নয়, দেওয়া-নেওয়া দুই-ই চলবে। আমাদের নেওয়ার আছে বস্তুবিজ্ঞান, দেওয়ার আছে অধ্যাত্ম-সম্পদ; দেওয়া-নেওয়া না হলে আত্মসম্মান বজায় রেখে কেউ চলতে পারে না, আমরাও পারি না। সে কথা আমাদের বিশেষ করে মনে রাখা উচিত—সাহিত্য-সম্পর্কে। সংস্কৃত সাহিত্যের ভিত্তি সুদৃঢ়; বহু কাল এর পরীক্ষা করে গেছে; বহু দেশের মনীষী এর সাহিত্য-বিচার অর্থাৎ

সাহিত্যশাস্ত্রকে পরীক্ষা করে দেখেছেন। তাঁরা সকলেই এর যশোগানে মুক্তকণ্ঠ, আমরাই কি শুধু দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা ভুলে রইব? এ হেন সম্পদ থাকতে আমাদের সাহিত্য-সৃষ্টি ও সাহিত্য-বিচারে তাকে কাজে লাগাব না? -

"পুরাতনই চিরনবীনতার অক্ষয় ভাণ্ডার। আজ যে নবকিশলয়ে বনলক্ষ্মী উৎসববস্ত্র পরিয়াছেন, এ-বস্ত্রখানি আজিকার নহে—যে ঋষি-কবিরা ত্রিষ্টুভ্ ছন্দে তরুণী উষার বন্দনা করিয়াছেন তাঁহারাও এই মসৃণ চিক্কণ পীতহরিৎ বসন-খানিতে বনশ্রীকে অকস্মাৎ সাজিতে দেখিয়াছেন—উজ্জয়িনীর পুরোদ্যানে কালিদাসের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে এই সমীরকম্পিত কুসুমগন্ধি অঞ্চলপ্রান্তটি নবসূর্যকরে ঝলমল করিয়াছে। নূতনত্বের মধ্যে চিরপুরাতনকে অনুভব করিলে তবেই অমেয় যৌবনসমুদ্রে আমাদের জীর্ণ জীবন স্নান করিতে পায়। আজিকার এই নববর্ষের মধ্যে ভারতের বহু সহস্র পুরাতন বর্ষকে উপলব্ধি করিতে পারিলে, তবেই আমাদের দুর্বলতা আমাদের লজ্জা আমাদের লাঞ্ছনা আমাদের দ্বিধা দূর হইয়া যাইবে।...অদ্যকার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চিরপুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব—সায়াহ্নে যখন বিশ্রামের ঘণ্টা বাজিবে, তখনো তাহা ঝরিয়া পড়িবে না—তখন সেই অম্লানগৌরবমাল্য-খানি আশীর্বাদের সহিত আমাদের পুত্রের ললাটে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে নির্ভয়চিত্তে সবলহৃদয়ে বিজয়ের পথে প্রেরণ করিব।"

—ভারতবর্ষ

আমাদের প্রতিটি মুহূর্তেই তো নবজীবন এসে আমাদের বরণ করে নিয়ে চলেছে; নববর্ষের উপলক্ষে উচ্চারিত কবি-গুরুর এই কথাগুলি কি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি আমাদের মনোভাব কেমন হওয়া উচিত, তা-ও সূচিত করে না?

"সংস্কৃত সাহিত্য না জানলে ভারতের উন্নতি অসম্ভব কেন?" —এর পরেও যদি কেউ আমায় এমনধারা প্রশ্ন করেন, তবে তার উত্তরে আমার এইটুকু বলবার রইল যে সংস্কৃত না জানা থাকলে যাঁরা ভাবনাকে চিন্তাকে আদর্শকে রূপ দেবেন, তাঁদের অসম্পূর্ণতা থেকেই যাবে। হ্যামলেটের মনোভাব লক্ষ্য করবার জন্য যখন তাঁর সহপাঠী দুজন রাজার চর হিসাবে তাঁর কাছে এসে জুটল, তখন হ্যামলেট তাদের হাতে বাঁশী দিয়ে বললেন, বাজাও। তারা বাঁশী বাজাতে জানে না; হ্যামলেট তখন বললেন, তোমরা বাঁশী বাজাবার অন্ধিসন্ধি জান না, মানুষের মনের অন্ধিসন্ধি বুঝতে পারবে ভেবেছ? সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের লোকের যে নাড়ির যোগ আছে; তখন সংস্কৃত সাহিত্য না জানা থাকলে এদের ধাত বোঝা যাবে না। আমি অবশ্য তাঁদেরই কথা বলছি, যাঁরা মানুষের মনের খোঁজখবর রাখতে চান, যাঁরা নিপুণ চিকিৎসক হতে চান; শুধু হাতুড়ে বা কম্পাউণ্ডার হবার জন্য সংস্কৃত জানার আবশ্যকতা নাই, তা স্বীকার করতেই হবে।

উত্তরাধিকার যে বুঝে নিতে পারে না, তার বুদ্ধির আমরা প্রশংসা করি না। আমাদের সুপ্রাচীন সমৃদ্ধ সাহিত্য,

বিদেশে যার অধ্যয়ন অধ্যাপনা সমধিক অনুরাগভরে বহুদিন ধরে চলছে, তা কি আমাদের কাছে অনাদরে পড়ে থাকবে? 'ত্রিকালজ্ঞ' হওয়ার কথা অবশ্য নয়, মানুষ ইচ্ছা করলেই তা হতেও পারে না,—কিন্তু ভবিষ্যৎকে যে গড়তে চায় তাকে অতীতের খোঁজ নিতে হবেই, একেবারে সব ধুয়ে পুঁছে আমরা হয়তো নতুন করে তৈরি করতে পারি, অন্ততঃ চেষ্টা চলতে পারে, কিন্তু বারবার দেখা গেছে, ঘুরে ফিরে সেই পুরানোতে আবার ফিরে আসতে হয়। আমরা যদি পুরানোতে ফিরে (অবশ্য সেইখানেই আটকে না গিয়ে) বর্তমানে চলে আসি, তবে আমাদের জ্ঞান ও গতি হবে দুর্বার—আর বিশেষভাবে আমাদের প্রসঙ্গে অবশ্যজ্ঞাতব্য এককথা—কালিদাসকে. না জানলে রবীন্দ্রনাথকেও আমরা বুঝতে পারব না।

পঠনীয়: রবীন্দ্রনাথ—প্রাচীন সাহিত্য।
Keith—The Story of Classical Sanskrit,
Aurobindo—Kalidasa.

৩

আমাদের বাংলা সাহিত্য কতখানি কুলীন, অর্থাৎ কত কালের পুরানো, সে বিষয়ে জানতে আমাদের প্রথমেই ইচ্ছা করে। লোকে নিজের বংশের প্রাচীনত্ব নিয়ে গর্ব করে—আমাদের দেশেও, অন্য দেশেও। এক কালে ইংরেজ সমাজে হিসেব-নিকেশ চলত, কার পিতৃপুরুষেরা নর্মাণ্ডি থেকে বিজয়ী বীর উইলিয়মের সঙ্গে ইংলণ্ডে এসেছিলেন, এবং সেই পরিমাণে কৌলীন্যের কথাটাও বিবেচনা করা হত। সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্য যে অর্বাচীন, অর্থাৎ প্রাচীন নয়, একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে নেবেন। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যও যে আমাদের সাহিত্যের তুলনায় কালের হিসাবে প্রাচীন, একথা স্বীকার করতে অভিমানে ঘা লাগলেও কথাটা সত্য। প্রাচীন ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম রচনা যদি ক্যাডমনের কাব্যকে ধরা যায়, তবে তার তারিখ সপ্তম শতাব্দী। আর যা আমাদের প্রাচীনতম রচনা বলে দাবি করি, তা হল কতক গুলি দোহা বা পারমার্থিক ভাবের ছোট ছোট কবিতা, যা সুর করে গাওয়া হত। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সেগুলি রচিত হয়েছিল বলে যদি ধরা হয়, তাহলে উভয় সাহিত্যের মধ্যে তফাৎ দাঁড়ায় পাঁচশ বছরের। এতখানি অর্থাৎ পাঁচশ বছরের তফাৎ অবশ্য বরাবর কবিপ্রতিভার গুণগত প্রভেদের

পরিমাণ মনে করলে ভুল হবে। চসারের সঙ্গে কবিকংকণ মুকুন্দরামের সমতা আছে মনে করলে (যেমন পণ্ডিত কাউয়েল সাহেব মনে করেছিলেন) তফাৎ দাঁড়ায় দুশ বছরের; আর প্রথম ইংরেজি উপন্যাস অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৭৪১), দুর্গেশনন্দিনী উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৮৬৫); এও একটা হিসাব, এতে করে দেখা যায়, বাংলা সাহিত্য স্থাণু নয়, বিকাশের পথে উচিত গতিতে চলেছে; যাই হোক, তাতে কিন্তু একথা পালটায় না যে, আমাদের সাহিত্যের আরম্ভ দ্বাদশ শতাব্দীতে।

দোহাগুলির ভাষার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ভাষা-তাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন, বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা হতে ভেঙ্গে চুরে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির গোড়া পত্তন হয় ঐ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী ঘেঁসেই। তখন সেই ভাষাগুলির মধ্যে পার্থক্য ছিল খুব অল্প, তার পরে কালক্রমে পরস্পরের দূরত্ব বেড়েই চলেছে, প্রদেশে প্রদেশে অবস্থার বিভেদে বলবার ধরণ ও লেখার রীতি ক্রমেই নিজের নিজের স্বতন্ত্র পথ অনুসরণ করেছে, নিজ নিজ প্রয়োজনমত বিভক্তি-প্রত্যয় গড়ে উঠেছে বা বেছে নিয়েছে। প্রথম অবস্থায় মিল খুব বেশি ছিল বলে, বিভিন্ন প্রাদেশিকভাষা বা 'আধুনিক ভারতীয়' ভাষা দোহাগুলিকে নিজের নিজের বলে দাবি করে থাকে।

কায়া তরুবর পঞ্চবি ডাল
চঞ্চল চিএ পইট্‌ঠো কাল—

"কান্না হল তরু, তার ডাল পাঁচটি, চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট হল"—এর ভাবের সম্বন্ধে যাই হোক, ভাষা মৈথিলি না বাংলা না ওড়িয়া না হিন্দি, তা নিয়ে কিছু কিছু অল্পবিস্তর তর্ক-বিতর্ক হওয়াই স্বাভাবিক, আর তা হয়েছেও। দুই একটি নমুনা দিয়ে তার বিচার হবে না—বিচার করতে গেলে চাই আরও বেশি সংখ্যার দোহা, আরও খুঁটিয়ে দেখা। যাঁরা তা দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা অনুসারে বলা যায়, এই দোহা-গুলির ভাষা বাংলাই বটে।

দোহাগুলি খুঁজে পাওয়া গেছে কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতেই। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে সংস্কৃত পুথি খুঁজতে গিয়ে এদের আবিষ্কার করেন। দার্শনিক বা পারমার্থিক এই গানগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মুখে মুখে ফিরত, তাই এদের নাম দেওয়া হয় 'বৌদ্ধগান"—শাস্ত্রীমশায় নিজেই "বৌদ্ধ গান ও দোহা" এই নাম দিয়ে তাদের সম্বন্ধে বইখানি লিখেছিলেন। দোহা নামটি তাই বাংলাতে চলেছে, হিন্দী সাহিত্যে তুলসীদাসের বা কবীরের দোহা তো সব লোকেরই জানা।

সাহিত্যের প্রথম চেষ্টা ধর্মের বিষয় নিয়ে এ যে শুধু বাংলা সাহিত্যেই হয়েছে, তা নয়। অন্যান্য সাহিত্য পরীক্ষা করলেও প্রায়ই দেখা যাবে, সকল দেশের মানুষেরা সেকালে ধর্মকে সাহিত্যের বিষয়রূপে গ্রহণ করতে একটুও দ্বিধা বোধ করত না, বরং ধর্মই ছিল সাহিত্যের একমাত্র না হলেও

প্রধান বিষয়বস্তু। ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের আদিরূপ আলোচনা করতে গিয়ে এই জিনিসটা সকলেরই চোখে পড়ে। যাঁরা বিভিন্ন সাহিত্যে অভিজ্ঞ, আশা করি এবিষয় যে সত্য, সে কথার সমর্থন তাঁরা করবেন।

পারমার্থিক বা ধর্মের গান ছাড়াও মানুষের রোজকার কি কোন বিশেষ সুখদুঃখ নিয়ে, অথবা বিশেষ কোন ঘটনা নিয়ে গান রচনা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে খুব স্বাভাবিক। আমাদের দেশেও পূর্বকাল থেকে তা হয়ে এসেছে। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে সেদিনেও বরিশালের গ্রাম্যকবি কীর্তিপাশার 'বাবু রাজকুমারের' কথা গেয়েছেন; একালে গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্রের পালা যাঁরা রচনা করেছিলেন, তাঁদের কাছে অতুল ঐশ্বর্য ছেড়ে মায়ার বাঁধন কেটে তরুণ রাজার বেরিয়ে পড়াটাই ছিল রচনার প্রধান আকর্ষণ। বাস্তবিকই তো, অদুনা-পদুনাকে রেখে মায়ের উদ্দীপনায় তরুণ রাজা যেদিন রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন, যেদিন আবার তপস্যার সিদ্ধির পর তিনি ফিরে এলেন—তাঁর পিলখানার হাতী তাঁকে চিনতে পারল প্রথম—করুণ রসে ভরপুর সেই দুদিনের কাহিনী সে যুগে বাঙ্গালীর কাব্য পিপাসা মেটাতে পেরেছিল।

প্রাচীন কবিদের রচনা আরো কত গান আমাদের দেশের বুকে মিশে গেছে, কে তার খোজ রাখে! পালবংশের রাজারা যখন এদেশে রাজ্য করেন, তখন তাঁদের গৌরবে বাংলা ছিল উজ্জ্বল। মহীপাল ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা। তাঁর নামে

এখনও এক প্রকাণ্ড দীঘি দিনাজপুরে তাঁর কীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সে দীঘির বেড় প্রায় এক মাইল হবে। মহীপালের কথা নিয়ে এক গানও রচিত হয়েছিল; আর কাজে অকাজে সব কিছু উপলক্ষ্য করেই সে গান গাওয়া হত। তাই প্রবাদ রচিত হয়—'ধান ভানতে মহীপালের গীত।" কিন্তু কোথায় এখন সে গান? জনশ্রুতিতেই তার শেষ হয়ে রইল; খোঁজ করে তার এক আধ টুকরো পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু সে গানের পুরোপুরি উদ্ধার আর হল না, এমন কি বেশিটাও পাওয়া গেল না। এমন করে আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের কত বহুমূল্য নিদর্শন যে কালের সমুদ্রে একেবারে লয় পেয়ে গেছে, তার হিসেব কে করে! অবশ্য অন্যান্য দেশেও এইরূপ ঘটেছে, প্রাচীন সাহিত্য বহু পরিমাণে লোপ পেয়েছে।

কিছুকাল পরে বীরভূম জেলার কেঁদুলি গাঁয়ে বেজে উঠল সুমধুর কাকলী। অজয়তীরে কবি জয়দেব গাইলেন গোবিন্দের কথা, অপরূপ গীতগোবিন্দের কাব্যে।

যদি হরিকথাস্মরণে সরসং মনঃ
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥

পরবর্তী লেখকেরা জয়দেবকে 'কবি-নৃপতি-শিরোমণি' আখ্যা দিয়েছেন; যিনি দশাবতারের স্তোত্রের মারফৎ সারা ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তাঁর পক্ষে উপাধিপ্রাপ্তি অন্যায় বা

অসঙ্গত হয়নি। একবার আমি উড়িষ্যার কোন গ্রামে অতি সাধারণ এক ভিক্ষুকের কণ্ঠে এই স্তোত্রটির সম্পূর্ণ ও শুদ্ধ আবৃত্তি শুনেছিলাম। মনে হয়েছিল, ভারতীয় সংস্কৃতির এ এক অভিনব পরিচয়, আর এ পরিচয়ের কাছে আমাদের বিদ্যা কতখানি ম্লান! আবার কাশীর পরমশৈব পণ্ডিতকে শিবমন্দিরে বসে জয়দেবপদাবলী ভক্তিভরে আবৃত্তি করতে শুনেছি; বন্ধুরা বলেছেন, মহারাষ্ট্রের পণ্ডিত ও সাধক সমাজেও জয়দেব জীবিত রয়েছেন! ষাট বৎসর পূর্বে আমাদের সমাজে জয়দেবের এই পদাবলী কতখানি জীবন্ত ছিল, তা বুঝতে পারি যখন দেখি আমাদের এক চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক উপন্যাসে তাদের চরণগুলি ধরা পড়েছে; কখনও—"ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং—" বলে কল্কির স্তব, কখনও "জয় জগদীশ হরে" ধ্বনি, কখনও বা সংকেতবাক্য হিসাবে "ধীর সমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী," আবার—

"তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু।"

বাংলার বৈষ্ণব কবিদের আদি হলেন জয়দেব। তাঁর কিছুদিন পরেই অভিনবপদে কাব্যলক্ষ্মী লোকসমক্ষে আবার আবির্ভূত হলেন—

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর। চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল। পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই। তব হম পিয়া দূরদেশে না পাঠাই॥

শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরিষের বা। বরিষ এ ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি। সুজনক দুখ দিবস দুচারি॥

সংস্কৃতের আবরণ সরিয়ে দিয়ে ভাষায় অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়ালেন বিদ্যাপতি। তাঁর বাড়ী মিথিলায়, যে ভাষায় কাব্য করলেন তা-ও খাঁটি বাংলা নয়, তবু তিনি বাংলারই কবি। অন্য দেশে তাঁর প্রভাব তেমন ছড়ায় নি—আর পরে নবদ্বীপচন্দ্র যে ভাবে তাঁর কাব্যসাধনাকে মূর্তি দিলেন তাও আর কোথাও সম্ভব হয়নি। এই বিদ্যাপতি বাংলারই কবি, যদিও মৈথিল সাহিত্যের তরফ থেকে তাঁর জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছে। কী চমৎকার ভাষায় তাঁর কবিত্ব ঝলমল করছে! কোথাও খুঁত নেই, কোথাও জড়তা নেই! তাঁর "আজু রজনী হম ভাগে গমাওলুঁ" বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পরিচিত।

বিদ্যাপতির পরে এলেন চণ্ডীদাস। উভয় কবির পরস্পর দেখা হওয়ার সম্বন্ধে একটা কিম্বদন্তী আছে। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সম্পাদিত চণ্ডীদাস চরিতে তার একটা বর্ণনাও আছে। কিন্তু চণ্ডীদাস নিয়ে হয়েছে সমস্যা; যত দিন যায়, ততই সে সমস্যার জটিলতা বাড়ছে। "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন" বলে যে পুরানো বাংলা কাব্য আছে, সে-টি কার রচনা? ভাষা ও ভঙ্গীর দিক দিয়ে পদাবলীর সঙ্গে এ কাব্যটির পার্থক্য বিস্তর। এর কবি যদি আদি চণ্ডীদাস হন—তবে দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, তরুণীরমণ চণ্ডীদাস—পুরানো পুথি সম্বন্ধে আরো বেশি আলোচনা হলে হয়তো আরও বেশি

চণ্ডীদাসের আমরা দেখা পেতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, দ্বিজ চণ্ডীদাস কোথাকার লোক ? ছাতনার, না, নান্নুরের ? বাঁকুড়ার, না বীরভূমের ? অধ্যাপক যোগেশবাবুর বইখানিতে ছাতনা-বাসী চণ্ডীদাসের পরিচয় পাওয়া যায় ; অনেক লেখকের মতে দ্বিজ চণ্ডীদাস ছিলেন নান্নুরের লোক। 'চণ্ডীদাসচরিত' নিয়ে আরও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। আমাদের দেশে পণ্ডিত-সমাজে ওর প্রতি যেরূপ উপেক্ষা দেখান হয়েছে, তা আমার উচিত বলে মনে হয়নি। আমি নিজে অবশ্য ঐ মতেই, অর্থাৎ ছাতনার চণ্ডীদাসেই সায় দিই, ওর কথাবস্তু ইংরেজীতে মডার্ণ রিভিউ-এর ধারাবাহিক পাঁচসংখ্যায় প্রকাশিতও করেছি।

যা হোক, চণ্ডীদাসের পদ অপূর্ব, গান একেবারে বাঙ্গালীর হৃদয়ের বস্তু। "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মনপ্রাণ"—সত্যই তো। যেমন মনের অবস্থা বর্ণনা, তেমনি রূপবর্ণনা ঃ—

সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমনি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা॥
থেহা নিঙ্গাড়িয়া কেবা মুখানি বনাল রে
জবা নিঙ্গাড়িয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে
ভুজ জিনিয়া কর-শুণ্ড॥

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের ভাগবত পদাবলী নূতন করে প্রাণ পেল মহাপ্রভুর জীবনীতে। তঁার জন্ম ১৪৮৬ খ্রীঃ, বাংলা ৮৯২ সালে, ফাল্গুনী পূর্ণিমার দোলের দিন। তিনি বেঁচে ছিলেন আটচল্লিশ বৎসর। প্রথম চব্বিশ বৎসর তিনি ছিলেন অদ্ভুত প্রতিভাশালী পণ্ডিত, তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রবিচারে কেউ বড় একটা এঁটে উঠতে পারত না। তিনি যখন পূর্ববঙ্গে দেশভ্রমণে শাস্ত্রবিচারের জন্য গেছেন, তখন তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী প্রাণত্যাগ করেন। শোকে তিনি চলে যান গয়ায়, সেখানে কি যে দেখলেন তা আমরা শুনতে পাই নি ; তবে তখন থেকে সংসার আর তাঁকে বাঁধতে পারে নি, তিনি যথারীতি সন্ন্যাস নিলেন। তাঁর সন্ন্যাসজীবনও ২৪ বৎসরের, তার মধ্যে ১৮ বছর কাটে পুরীতে, ৬ বছর ভারত-পরিক্রমায়।

চৈতন্যদেব বাংলা দেশে ও সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে ধর্মের বন্যা বহালেন। তাঁর হরিনামের তোড়ে শুধু "শান্তিপুর ডুবুডুবু, নদে ভেসে যায়" নয়, সমস্ত বাংলাদেশই ভেসে গিয়েছিল— এমন কি, ভারতবর্ষও পার পায় নি। তাঁর নাম-ভক্তির সঙ্গে ভাগবতের গোপীপ্রেম দেখা দিল, একদিকে কঠোরতা ও সংযম, অন্যদিকে কান্তভাব—দুইয়ের এক অদ্ভুত অপূর্ব সম্মেলন আমরা দেখলাম তাঁর চরিত্রে ও জীবনে। একটিকে বাদ দিলে অন্যটি বোঝা যাবে না। বৈষ্ণব-মহাজনদের কোমলকান্ত পদাবলীর পটভূমি যে গোরাচাঁদ, আজকার কীর্তনিয়ারাও সে কথা ভুলতে পারেন না, তাই কোনও পালা গাইতে হলে, তাঁরা গৌরচন্দ্রকে

নিয়ে, অর্থাৎ 'গৌরচন্দ্রিকা' দিয়ে আরম্ভ করেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনটীকা সঙ্গে না রাখলে মধুর পদের সে অপূর্ব অমৃতময় মূল যে বুঝতেই পারা যাবে না।

চৈতন্যদেবকে আশ্রয় করে যে নব ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল, তার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠল অভিনব সাহিত্য। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃত, কড়চা ও ডায়েরী-জাতীয় লেখা, আরও কত কি জীবনীগ্রন্থ বাংলা ভাষায় দেখা দিল; জীবনী সাহিত্যই যে বাংলায় এই নতুন। মহাপ্রভুর জীবনী বাংলার এক পরম সম্পদ, তার কথা মাত্র আশ্রয় করে নানারূপের গ্রন্থ চলে এল! তবে এখনও তাঁর বিস্তৃত জীবনী, নিখিল ভারতের দৃষ্টিতে এবং আজকার দিনের উপযোগী করে লেখা হয় নি। দার্শনিকতা যা চরিতামৃতে দেখা দিল, তা ক্রমে অন্যান্য সন্দর্ভেও স্থান পেল, এ-ও একটা নতুন দিক। তাঁর সময় থেকে নবজীবনের সূচনা, তাই বৈষ্ণবেরা এই সময়কে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য চৈতন্যাব্দের প্রবর্তন করেন।

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের ধারা চলল বিচিত্র খাতে, অব্যাহত-রূপে। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস ও অন্যান্য মহাজন সে ধারা স্পষ্ট করতে করতে চললেন। ফলে যাকে প্রধানতঃ বলে বৈষ্ণব সাহিত্য, তার হল সৃষ্টি। এ সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট ভাগ। যাঁরা এ সাহিত্যের রসিক, তাঁরা জানেন বৈষ্ণবেরা সাহিত্য রচনা করেছিলেন সাহিত্য হিসাবে নয়, সাধনা হিসাবে, ধর্ম হিসাবে, প্রাণের অভিব্যক্তি হিসাবে, অর্থাৎ

সে সাহিত্যে পোষাকি ভাব, জীবনের বহির্ভূত একটা ভাবের ছায়া এসে পড়ে নি। আমাদের কারো কারো কাছে সাহিত্য বিলাসমাত্র, শুধুই অলস কল্পনা, কিন্তু এঁদের কাছে সাহিত্যই জীবন, অথবা জীবনের অভিব্যক্তিই হল সাহিত্য। এতে করে বৈষ্ণবপদের আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন বা সন্দেহ করা চলে না।

নীচে উদ্ধৃত জ্ঞানদাসের পদটি পড়লে আন্তরিকতায় ভরপুর সেই সুরটির সন্ধান পাওয়া যাবে, এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার আর কোনও প্রয়োজন থাকবে না।

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণধন, এ দুটি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক, হিয়ার পুতলি, নিমিখে নিমিখে হারা॥
তোরা কুলবতী, ভজ নিজপতি, যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিনু, শ্যাম বঁধু বিনু, আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও কুলের ধরম মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া রসের পরাণ আর কার জানি হয়॥
যে মোর করমে লিখন আছিল বিহি ঘটাওল মোরে।
তোরা কুলবতী দেখিনু যুকতি কুল লৈয়া থাক ঘরে॥
গুরু দুরজন বলে কুবচন না যাব সে লোকপাড়া।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পীরিতি জাতিকুলশীল ছাড়া॥

এই জ্ঞানদাসেরই সেই সুপরিচিত পদ—"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু"…এঁরই সেই ক্ষোভোক্তি—"আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া;" এঁরই সেই—"তোমার

গরবে গরবিনী আমি রূপসী তোমার রূপে ;” আবার, “প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।” বৈষ্ণবপদের কথা বলতে গেলে এদের কথাই আগে মনে আসে। কাটোয়ার কাছে কাঁদরাগ্রামে ১৫৩০ খ্রীঃ এঁর জন্ম। সুতরাং মহাপ্রভুর ঠিক পরেই এঁর আবির্ভাব হয়েছিল। এঁর আর একটি পদ আজকাল কীর্তনিয়াদের মুখে খুব শুনতে পাওয়া যায়—

চিকণ কালিয়ারূপ মরমে লেগেছে গো ধরণে না যায়, মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া মুখানি মাজিয়াছে, না জানি কতেক সুধা দিয়া॥
অধরের দুটি কূল জিনিয়া বান্ধুলি ফুল, হাসিখানি মুখেতে মিশায়।
নবীন মেঘের কোরে বিজুরি প্রকাশ করে জাতিকুল মজাইলাম তায়॥
ভুরুযুগ সন্ধান কামের কামান বাণ, হিঙ্গুলে মণ্ডিত দুটি আঁখি।
অরুণ নয়ানের কোণে চাঞাছিল আমাপানে সেই হইতে শ্যামরূপ দেখি॥
যমুনার ঘাট হইতে উঠিয়া আসিতে পথে সখী কিবা অপরূপ তনু।
জ্ঞানদাসেতে কয়, শুধুই সে সুধাময় গোকুলে নন্দের বালা কানু॥

গ্রামোফোন রেকর্ডের যোগে আরও একটি পদ বাঙ্গালীর সুপরিচিত—

গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব শঙ্খের কুণ্ডল ধরি।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে যেখানে নিঠুর হরি॥
মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে খুঁজিব যোগিনী হঞা।
যদি কারু ঘরে মিলে গুণনিধি বাঁধিব বসন দিয়া॥

আকাশবাণী ও গ্রামোফোন রেকর্ডের যোগে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রচার বাংলাদেশে আরও বাড়বে, একথা মনে করা অসংগত নয়।

জ্ঞানদাসের নাম করলাম, পদও কিছু কিছু উদ্ধৃত করলাম, কিন্তু এই সময়ে দেশে বিস্তর সুকবি ও সুভক্তের আবির্ভাব হয়, তাঁদের সকলের কথা খুলে বলতে পারলাম না। বৈষ্ণব সাহিত্য বিশাল, পদাবলীর পরিমাণও সমুদ্র। জ্ঞানদাসের বন্ধু আউলে মনোহর দাস এসব পদের সংগ্রহ সর্বপ্রথম করেন, তাদের সংখ্যা ছিল পনের হাজার; তিনি সংগ্রহের নাম দেন 'পদ-সমুদ্র'। ঠিক তার পরেই রাধামোহন ঠাকুর সংকলন করেছিলেন 'পদামৃতসমুদ্র', আর সঙ্গে সঙ্গেই সংস্কৃত ভাষায় লেখা তাঁর টিপ্পনীও জুড়ে দিয়েছিলেন। দুখানি সংগ্রহই তৈরি হয় ষোড়শ শতকের শেষে। তার প্রায় একশ বছর পরে পদ-কল্পতরু (পদসংখ্যা তিন হাজারের বেশি), পরে পদকল্প-লতিকা, গীতি-চিন্তামণি ও অন্যান্য ছোটবড় অনেক পুথি সংকলিত হয়েছিল।

অতীতের আবরণ ভেদ করে এখনও যে সব কবিদের ভাবময় শব্দতরঙ্গ আমাদের কানে ভেসে আসছে, তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ দুজনের নাম এখানে না করলে চলবে না, তাঁরা প্রসিদ্ধ বলরামদাস ও গোবিন্দদাস। একই নামের একাধিক কবি আছেন বটে, একাধিক বলরামদাস ও একাধিক গোবিন্দ-দাস—আমরা সে সব সমস্যার ভেতর এখন যাব না, তবে এ দুজনার দুই একটি পদের উল্লেখ করা চাই-ই। বলরামদাসের পদবন্ধের মধ্যে মনে হয় বিদ্যাপতি-চণ্ডিদাস দুজনারই প্রভাব আছে, ব্রজবুলিতেও রচনা করেছেন, আবার বাংলাতেও গান গেয়েছেন। নিছক বাংলার উদাহরণ—

এস বঁধু, আর বার খেলি হে ফাগুয়া।
এবার হারিবে যদি তোমা ফাগুহারা নিরবধি জগভরি গাব এই ধুয়া ॥
কিন্তু চাঁদবদনি ধনী কর অভিসার।
নব নব রঙ্গিনী রসের পসার ॥

বাসন্তী রাসের এই পদে দুটো ঢং মিশে গেছে, আবার একই পদের মধ্যে 'হেরি' ও 'হেরিয়া' দুই রকমই চলেছে দেখে মনে হয়, কবিরা অত বেশি কড়াকড়ি করতেন না, তাঁরা কাব্য লিখতেন, পদ বাঁধতেন, এবং মৈথিলী বা ব্রজভাষার শৈথিল্যের সুযোগ পুরোপুরি নিয়েছিলেন।

গোবিন্দদাসের পদগুলির মধ্যে একটি আগাগোড়া উদ্ধৃত করি; তাহলে তাঁর ভাষা ও ভাবাবেগ দুইয়েরই খানিকটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

এই তো মাধবী-তলে আমার লাগিয়া পিয়া যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া কেনে ফাটিয়া না পড়ে গো. নিলাজ পরাণ নাহি যায় ॥
সখি হে, বড় দুখ রহল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহল গিয়া এই বিধি লিখিল করমে ॥
আমারে লইয়া সঙ্গে কেলি-কৌতুক-রঙ্গে ফুল তুলি বিহরই বনে।
নব কিশলয় তুলি শেজ বিছায়ই রস পরিপাটীর কারণে ॥
আমারে লইয়া কোরে অনিমিখে মুখ হেরে যামিনী জাগিয়া পোহায়।
সে হেন গুণের পিয়া কোনখানে কার সনে কৈছনে দিবস গোঙায় ॥
এতেক দিবস হইল প্রাণনাথ না আইল কারু মুখে না পাই সংবাদ।
গোবিন্দদাসচিত আঁখি বহু ঝুরত দারুণ বিরহ বিষাদ ॥

আমাদের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, গোবিন্দদাস—এই কয়জনের শুধু নাম করলাম, কিন্তু সকলেই তো জানেন, আসলে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাণ্ডার প্রচুর, বহুদিন ধরে সে রসের পরিবেশন চলছে—তিন শ বছরেরও বেশি। পূর্বে বলেছি, আবারও বলি—কোথাও সে রসের শুধু সাহিত্যভাবে পরিবেশন কিন্তু হয় নাই। যাঁরা দরবারি সাহিত্য বা সামাজিক অবস্থা বা পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে নতুন নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করতে চান, আমাদের সাহিত্য বিশেষতঃ বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে মতামত প্রচার করতে তাঁদের একটু সাবধান হতে অনুরোধ করি। বৈষ্ণব সাহিত্য ছিল জীবনের ধর্মসাধনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কবিগুরু অবশ্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?

মানবের মনের গহন কোণে, দেবারাধনার ব্যাকুলতার সঙ্গে মিশে আছে যত কোমল বৃত্তিগুলি, কবি বা গীতিকার তাদের ফুটিয়ে তুলেছেন অভিনব উপায়ে, কিন্তু তার পেছনে তো ঐ মানবতার ভাবই আছে ? কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার নয়, তবে সেই সঙ্গে একথাও জোর করে বলা যায়—

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান।

বৈষ্ণবেরা পদ রচনা করেছেন আমরা গবেষণা করব বলে নয়, "বঁধু কি আর কহিব আমি" বা ঐরূপ পদ 'মানবতার'

ভূমিতে প্রয়োগ করবার জন্যও নয়, ও-সব পদ ভক্তের সাধনার শোণিতে রাঙা, দেবতার চরণে অঞ্জলি দেওয়ার জন্য। তাই এদের স্থান একটু স্বতন্ত্র, আধুনিকতার বা 'মানবতার' মাপকাঠিতে এদের বিচার করে যাতে ভুল না করি, সেজন্য সাবধান থাকা দরকার।

"ভক্তের জাত নেই" বলে একটা কথা আছে। এই সব পদকর্তাদের কেউ কেউ হিন্দু ছিলেন না। সাধনার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানে অন্ততঃ তখনকার দিনে কোনও মর্মান্তিক বিরোধ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলার মুসলমান বৈষ্ণব-কবিদের সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য একবার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। তার কোনও ফল আমি জানি না, সুতরাং কিছু বলতেও পারিনা। তবু কোনও ভাল সংগ্রহপুস্তক থেকে এরূপ কবির সরস রচনার উদাহরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

শ্যাম বঁধু, আমার পরাণ তুমি।
কোন শুভদিনে দেখা তোমা সনে
পাসরিতে নারি আমি॥
যখন দেখিয়ে ও চাঁদ বদনে
ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আনচান
দণ্ডে দশবার মরি॥

এই পদ শুনে কে বলতে পারেন যে এর রচয়িতা একজন মুসলমান? কবির নাম কিন্তু সৈয়দ মর্তুজা।

কনক-কেতকি-চম্পা-তড়িত-বরণী।
ইন্দিবর-নীলমণি-জলদ-বসনী॥
মৃগজ-পংকজ-মীন-খঞ্জন-নয়নী।
কামধনু ভ্রমর-পংক্তি ভুরু-ভুজংগিণী॥

—এই কবিতার টুক্‌রো শুনে কার সাধ্য মনে করে যে এ-ও এক মুসলমান কবিরই রচনা? বাস্তবিক কিন্তু তাই, পদকর্তার নাম সালবেগ। এ রকম আরও অনেক মুসলমান পদকর্তা আছেন। সাম্প্রদায়িক কলহ এখনকারই সৃষ্টি, এ কথা বলা অবশ্য জোর বলা, আবার সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর কথাও সত্য, তাও অস্বীকার করা যায় না;—আমরা খেয়োখেয়ি করে মরেছি বরাবর, এ মিথ্যা। না হলে মুসলমান পদকর্তা আমাদের দেশে সম্ভব হত না।

প্রায় একশ বছর পূর্বে আমাদের দেশের একজন কবি, বৈষ্ণব কবিতাকে নতুন খাতে, যাত্রার মধ্য দিয়ে, যাত্রার গানের আকারে নিয়ে আসার বিষয়ে পটুতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর নাম কৃষ্ণকমল গোস্বামী। তাঁর স্বপ্নবিলাস, রাই-উন্মাদিনী, বিচিত্রবিলাস, বাংলাদেশের উপর দিয়ে কৃষ্ণপ্রেমের বন্যা আবার বইয়েছিল।

এখানে তাঁর লেখা শুধু একটি গানেরই উল্লেখ করি—

যখন নব অনুরাগে আমার হৃদয়ে লাগিল দাগে
বিচারিলাম আগে পাছের কাজে—যা-যা করতে হবে গো—
প্রেম করে রাখালের সনে ফিরতে হবে বনে বনে
কত ভুজংগ কণ্টক পংক মাঝে—
সখি, আমায় যেতে যে হবে গো—
রাই বলে বাজিলে বাঁশি আমায় যেতে যে হবে গো।
অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল, চলাচল তাহাতে করিতেম,
সখি. আমায় চলতে যে হবে গো।
বঁধুর লাগি পিছল পথে চলতে যে হবে গো!
হইলে আঁধার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি,
গতাগতি করিয়ে শিখিতেম;
সদা আমায় ফিরতে যে হবে গো, কণ্টক-কানন মাঝে।
আনি বিষবৈদ্যগণে বসায়ে অতি গোপনে তন্ত্র মন্ত্র শিখেছিলাম কত,
রাই বলে ডাকিলে বাঁশি যেতে যে হবে গো।

এসব গানের জন্য কৃষ্ণকমল তাঁর নিজের ঢং-এ গৌর-চন্দ্রিকাও রচনা করেছিলেন:—

স্বাদিতে নিজ মাধুরী নাম ধরি গৌরহরি. হরি বিরহেতে হরি
কাঁদি বলে হরি হরি।

বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে আধুনিক সাহিত্যপাঠকদের মধ্যে একটু বিরাগ প্রচারের চেষ্টা দেখে'ছি বলে এইখানে সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলে নিই। বৈষ্ণব কবিদের কোমল ভাব

কার কার কাছে লাগে বড় বিসদৃশ, শুধু উচ্ছ্বাস, মূর্ছা, —এসব তাঁদের ভালো তো লাগে নাই, তাঁরা বলেন, জাতির পক্ষে এ সব বড় মারাত্মক রকমের ক্ষতিকর। কিন্তু উচ্ছ্বাস, মূর্ছা, কান্না—সাহিত্য থেকে এসব নির্বাসিত করা সম্ভবও নয়, তার কোন প্রয়োজনও নাই। করুণরস সাহিত্যের এক প্রধান রস, শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, সব সাহিত্যেরই। আমাদের পরাধীন যুগে আমরা হাতের কাছে যা পেতাম তা-ই কারণ বলে মনে করতাম। যাঁরা বীররসের রসিক তাঁরা নিশ্চয় বীররসই পছন্দ করবেন, কিন্তু তাই বলে এটাও মনে রাখতে হবে যে শুধু আস্ফালন করলে যা উৎপন্ন হবে তা হবে হাস্যরসের উপাদান। আর একটা কথা, প্রসঙ্গান্তরের একটা উক্তি এ ব্যাপারেও খাটে—যো হ্যেকসক্ত : স জনো জঘন্যঃ। তা ছাড়া, বৈষ্ণবসাহিত্য শুধু করুণরসের সাহিত্য নয়, বাৎসল্য ও মধুর রসও এতে আছে—তবে আপত্তিটা যাঁরা করে থাকেন তাঁরা বীররসের দোহাই দেন বলেই আশা করি এ উত্তর নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বৈষ্ণবসাহিত্য সম্বন্ধে আর এক আপত্তি হোল এই যে, ওতে জাতটাকে দুর্বল করে দিয়েছে। তাই বৈষ্ণবধর্ম, ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতিও কেউ কেউ কটাক্ষ করে থাকেন। এই কটাক্ষকে আমি কোনও দিনই আমল দিই না। যে ধর্ম, যে বিরাট ব্যক্তিত্ব, যে অনুপম সাহিত্য আমাদের দেশে সেদিন ফুটে উঠেছিল, তা শক্তিহীন তো ছিলই না, বরং তার শক্তির

দাপটে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে, সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও জাতিকে করেছে প্রেমের মহা মহিমায় গৌরবান্বিত। আর বৈষ্ণব যদি দুর্বলতার সাধক হন, তবে শক্তিসাধকও তো আমাদের প্রচুর ছিলেন ও আছেন, তাঁরা কেন দেশ ও জাতিকে বড় করে তুলতে পারেন নাই? কথা তা নয়, হীনতার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করতে হবে।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আমরা আমাদের যা সম্পদ আছে তা এভাবে অবহেলা করে সুবিবেচনার পরিচয় দিই না। সত্যই যদি অতীতের বৈষ্ণবপদের রচনায় আমরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে থাকি, তবে বর্তমানে তার প্রতি নাসিকা কুঞ্চিত করা ভাল নয়—নৈতিক অর্থে বলছি না, সে তো আছেই, লাভের দিক দিয়েও বুদ্ধির কাজ নয়। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও গভীরতা দুই-ই বাড়ুক, আমাদের দৃষ্টি প্রসার লাভ করুক, কিন্তু তাই বলে আমাদের যা ভাল আছে তার নিন্দা করা শুধু নিষ্ফল নয়, দোষেরও বটে।

পঠনীয়: কৃষ্ণদাস কবিরাজ—চৈতন্যচরিতামৃত।
দীনেশচন্দ্র সেন—Vaishnava Literature of Medieval Bengal.
অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র—পদামৃতমাধুরী।

পদ গাইবার জন্য, কিন্তু কাব্য পড়বার জন্য—ঘটনাবলীর বিশেষ বিশেষ রস ফোটাবার জন্য—এমনি একটা ভাগ আমাদের দেশের সাহিত্যে করা যেতে পারে, যদিও আমাদের দেশে ইতিপূর্বে কাব্যও গাওয়াই হয়েছে, অর্থাৎ সুরে পড়া হয়েছে, এবং প্রয়োজনমত তাকে অভিনয়ের উপযোগীও করা হয়েছে, যাতে করে লোকের সামনে তাকে দাঁড় করান যায়। সংস্কৃত অলংকারগ্রন্থ সাহিত্যদর্পণের প্রসিদ্ধ রচয়িতা বিশ্বনাথ কবিরাজ, দৃশ্য ও শ্রব্য, কাব্যকে এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন; কোনও কোনও দেশে লিরিক ও এপিক—এই হয়ে থাকে প্রথম যুগের সাহিত্যের মোটামুটি ভাগ; এই শেষেরটি অনুসরণ করে আমরা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যকে পদ ও কাব্য এই দুই ধারায় ভাগ করে দেখলে পারি, কতদূর যাওয়া যায়; তবে 'কাব্য' বলতে বুঝতে হবে কবিতার এমন এক রূপ, যার মধ্যে কাহিনী বা আখ্যায়িকা বা ঘটনা কিছু একটা আছে, অর্থাৎ 'কাব্য'কে বিশেষ এক অর্থে প্রয়োগ করতে হবে।

ও দুই ভাগের মধ্যে বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে আসলে মাত্রার অর্থাৎ পরিমাণের প্রভেদ বুঝতে হবে। এর পূর্বে মাণিকচাঁদের গান ও মহীপালের গীতের কথা বলেছি। পদের মধ্যেই তাদের ধরেছি। ঐ গানই বড় হলে, তার মধ্যে বস্তুর পরিমাণ আরও বাড়ালে, তা হবে 'কাব্য', এই বিশেষ অর্থে; অর্থাৎ

ঐ গানেই ছিল 'কাব্যে'র বীজ, কালক্রমে তা অংকুরিত হোল, আয়তনে ও প্রকৃতিতে বেড়ে উঠল, প্রসাল লাভ করল।

এ ধরণের পুরান কাব্যের মধ্যে নাম করা যেতে পারে 'গোরক্ষবিজয়ের"। গোরক্ষনাথ ছিলেন নাথ সম্প্রদায়ের সিদ্ধ-পুরুষ ; তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর লোভ, ও সাময়িক পতন, পরে শিষ্যের হাতে তাঁর উদ্ধার—এই সব হোল এ কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়-বস্তু। এই বিষয় নিয়েই কবির চেষ্টা চলেছে ভাল করে বলতে, বিভিন্ন ঘটনাগুলিকে যথাযথ বর্ণনার সাহায্যে ও প্রসাদগুণের সাহায্যে এমন করে ধরতে, যাতে সমস্ত বক্তব্য সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়। হয়তো অতীতে এই ধরণের আরও কত কাব্য আমাদের ভাষায় ছিল, তাদের মধ্যে একটিমাত্র কাব্য কালক্রমে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে !

'গোরক্ষবিজয়' আমাদের কাছে আবিষ্কার ছাড়া আর কিছু নয়, আমাদের বর্তমান জীবনধারার সঙ্গে ওর কোনও সংস্রব আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু এমন কাব্যও আমাদের দেশে ছিল ও এখনও রয়েছে, যার পরম্পরা আছে ; তাদের উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে 'পদ্মপুরাণের' ! দুটো কাল্চারের না হক, অন্ততঃ দুটো 'কাল্ট'-এর সংঘর্ষ ; শিবের পূজাই সংসারে প্রচলিত, পদ্মা সেখানে নিজেরও পূজার একটা ব্যবস্থা করে নিতে চান। নাগজগতের দেবী তিনি, নরজগতের দেবী হওয়ার তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু শিবের ভক্ত চাঁদ সদাগর শিবের পা আঁকড়ে ধরে রয়েছেন, অন্য দেবদেবীকে তিনি আমল

দিতে রাজি নন—তাদের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা। পদ্মা চাঁদ সদাগরকে সর্বহারা করবার জোগাড় করলেন; তাঁর ধন-দৌলত গেল, কিন্তু চাঁদ সদাগর তাতে ঘাবড়াবার লোক ছিলেন না; তাঁর ছেলেরাও একে একে গেল, একমাত্র লখিন্দর ছিল বাকি, তাকেও বিয়ের রাতে সাপে কামড়াল; কিন্তু লখাইয়ের স্ত্রী বেহুলার পতিভক্তি ও ত্যাগের সাধনায় পদ্মা খুসি হলেন, মরা লখিন্দর জীয়ে উঠল, এমন কি চাঁদ সদাগরও পদ্মাকে পূজা করতে রাজি হলেন; দুর্ভাগ্যের নানা ভয়ংকর রূপ যাঁকে টলাতে পারে নি, সৌভাগ্যরূপ প্রসাদ পেয়ে তিনি দেবীর পূজা মেনে নিলেন। চাঁদের তেজ ও বেহুলার নিষ্ঠা পাঠককে এ কাব্যে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

কানা হরিদত্ত নামে একজন কবি প্রথমে মনসার গান রচনা করেন; কালমাহাত্ম্যে সে গান লোপ পেল; হরিদত্তের গান এখনও পাওয়া যায় নি সমগ্রভাবে, তিনি কোন্ সময়কার লোক তাও আমরা জানি না—দীনেশবাবুর অনুমান, "একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে", এ অনুমানের তেমন কোনও ভিত্তি নাই। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণের অবশ্য রচনাকালের হিসাব পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে—সুতরাং এখন থেকে প্রায় সাড়ে চারশ বৎসর আগে—হুসেন সা যখন বাংলার নবাব, তখনকার লোক তিনি। তাঁর সময় থেকে আরম্ভ করে অন্ততঃ তেষট্টি জন কবির নাম দীনেশবাবু করে গেছেন, যাঁরা মনসার ভাসান নিয়ে কাব্য রচনা

করেছিলেন। আমাদের যুগে আমরা দীনেশবাবুকেও ঐ দলে ফেলতে পারি, কারণ তাঁর বেহুলা যদিও বর্তমান যুগের সাজ পরেছে, তবু প্রাণ তার পড়ে আছে পুরানো কথাতেই, আর সব চেয়ে বড় কথা হোল এই যে কাব্যের প্রাণ তাতে আছে। বিজয়গুপ্তের বংশধরেরা বহুদিন ধরে বরিশাল জেলায় ফুল্লশ্রী গ্রামে তাঁর ভিটায় পুথিখানি সযত্নে রক্ষা করে এসেছেন।

চণ্ডীর পূজোর জন্যও এই ধরণের কাব্য রচিত হয়েছিল, যাতে সমাজ চণ্ডীর পূজা গ্রহণ করে, লোকে শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁর পূজা করে ; তাতে ঐহিক পারত্রিক দুই রকমই মঙ্গল লাভ হবে, তাই কাব্যের নাম হল চণ্ডীমঙ্গল, যেমন পদ্মাপুরাণের নাম কোনও কোনও কবি করেছেন মনসামঙ্গল। কালকেতু ব্যাধ ছিল, চণ্ডীর পূজা করে হয়ে গেল রাজ্যাধিপতি। শ্রীমন্ত সদাগর চণ্ডীর পূজা করে বন্দী পিতাকে মুক্ত করল, নিজে আসন্ন মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পেল, আরও কত সৌভাগ্য লাভ করল। এক কালে—আমাদের ছেলে বেলায়ও—ঘরে ঘরে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হত, ব্রতকথা শোনান হত। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার সময় মঙ্গলচণ্ডীর নির্মাল্য লোকের মাথায় ছোঁয়ানো হত, পরীক্ষার সময় গুরুজনেরা পকেটে দিয়ে দিতেন মঙ্গলচণ্ডীর ফুল কি নির্মাল্য। কালকেতু, শ্রীমন্ত সদাগর ও খুল্লনার দুঃখকষ্ট ও চণ্ডীর দয়া—তখনকার দিনে বই পড়ে জানতে হত না, বড়দের কাছে, মেয়েদের কাছে, কি ব্রত-উপবাসের দিনে ব্রতকথা শুনেই জানা যেত। অবশ্য কাব্যরূপ জানতে হলে কাব্য পড়তেই

হয়। এ কাব্য এখনও পুরান হয় নি, পড়ে এখনও লোকে খুশি হয়।

এক একজন দেবতার নামে একাধিক মঙ্গলকাব্য রচিত হোত। সেকালের কবিরা স্বতন্ত্রভাবে একই বিষয় নিয়ে কাব্যরচনা করতেন; পরস্পরের কৃতিত্ব বোঝবার তবু খানিকটা সম্ভাবনা থাকত। একালে নাটক উপন্যাস কবিতা রচনার ক্ষেত্রও যেমন পৃথক পৃথক, নাট্যকার ঔপন্যাসিক কবি এঁরাও তেমনি বড় একটা কোনও এক বিষয় নিয়ে সকলে রচনা করেন না—আমরা এ যুগে বৈচিত্র্যের প্রয়াসী, বৈচিত্র্য চাই।

মনসা ও চণ্ডীর কথা বলেছি; আমাদের পণ্ডিতেরা ও সাহিত্যিকেরা বর্তমান যুগে এঁদের কথা আলোচনা করেছেন, নতুন করে রূপ দিয়েছেন। আর একটি মঙ্গলের কথা বলি; এটি কিন্তু তেমনি করে বাংলাদেশ জয় করতে পারে নি—না সে-কালে, না এ-কালে। এটা নিতান্তই ভাগ্যের দোষ বলতে হবে, কারণ তার মধ্যে আছে যথেষ্ট বীররস, সে রস বাঙ্গালী চরিত্রের হিতকর, এবং ঘটনাস্থানও একেবারে বাংলাদেশ। ভাগ্যের দোষ বললাম বটে, কিন্তু তার সঙ্গে ভৌগোলিক কারণও আছে। ধর্মপুজা রাঢ়দেশে অর্থাৎ বাংলাদেশের বর্ধমান বিভাগেই চলে। তার বাইরে বড় একটা যায় নি, পূর্বোত্তর বঙ্গে তার বড় একটা প্রচলন হয় নি। যদি কোনও দিন কেউ বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশের বৈশিষ্ট্য তাঁর সাহিত্যে দেখাতে পারেন, যাকে regional study বলে তা করতে পারেন,

তাহলে আমি এ প্রসঙ্গে যা বলছি সেকথার আরও একটু মীমাংসা হয়। এক সময়ে আমার নিজের এ কাজে খুব একটা আগ্রহ ছিল ; কিন্তু কার্যগতিকে কিছুই করা হয় নি। বাংলা-দেশের বিভিন্ন স্থানের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। সেই সেই জায়গার লোকদের চরিত্রে ও সাহিত্যে সেই সেই বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠবার কথা। আমার অপেক্ষা সৌভাগ্যবান কেউ যত্ন করলে এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে পারবেন।

ধর্মমঙ্গলের কথা বলি। যেমন মঙ্গলচণ্ডীর কি মনসাদেবীর, তেমনি ধর্মরাজেরও তো পূজা চাই! ধর্মরাজের পূজা করলে অশেষ বিপদের থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় ; কর্ণসেনের ছেলে লাউসেন তার একেবারে 'জীবন্ত' উদাহরণ। কর্পূরও অলৌকিক প্রভাবে ভূমিষ্ঠ ; তবে 'অলৌকিক' তো মঙ্গলকাব্যের অনেকখানি জুড়ে থাকবেই, নইলে দেবতাদের মহিমা কেমন করে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে ? লাউসেন হলেন কর্পূরের দাদা, বীররসে গম্ভীর দাদার চরিত্রকে কর্পূর নিজের হাস্যরস দিয়ে পূর্ণতর করবার চেষ্টা করছেন। এ কাব্যে আরও একটু নতুন জিনিস আছে—বীররসে মেয়েরাও পিছ-পা নন, তাঁরাও পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে রণরঙ্গে মাতেন। কানাড়া-কলিঙ্গার ব্যাপার পাঠকের কাছে নতুন তো লাগবেই, ভালও লাগবে, তপোবলে যে অসাধ্যসাধন হয় তারও একটা সংস্কার মনের উপর পড়বে, যদিও আমাদের ঐতিহাসিকেরা কেউ কেউ বলেছেন—যাঁরা অনেক পুথিপাতড়া পড়ে ফেলে পাণ্ডিত্য অর্জন

করেছেন তাঁদের মধ্য থেকেও কেউ কেউ বলেছেন—এর বর্ণনা একঘেয়ে, এবং পড়তে গেলে ঘুমে: ঘোরে চোখ বুজে আসে! আমি কিন্তু কোন মতেই এ কথায় সায় দিতে পারলাম না।

এই মঙ্গলকাব্যখানিও কিন্তু অনেকে অনেকবার নিজের নিজের মত করে লিখেছেন—জন বারো তো বটেই। মাণিক গাঙ্গুলীর পুথি নাকি ১৪৬৭ খ্রীঃ—"শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে"—অর্থাৎ ৬ ঋতু ৪ বেদ ৭ সমুদ্র—"সিদ্ধ সহ যুগ পক্ষ যোগ তার সনে"—অর্থাৎ ৭ সিদ্ধ বা ঋষি ৪ যুগ ২ পক্ষ—যোগ করলে, ৬৪৭+৭৪২ বা ১৩৮৯ হয়; এ হোল শকাব্দ, ৭৮ যোগ করলে পাই খ্রীস্টাব্দ। এর ৬০ বৎসর পরে খেলারাম নামে একজন কবি ধর্মমঙ্গল রচনা করেন, তারও প্রায় ৮০ বছর পরে অর্থাৎ ১৬০৩ খ্রীঃ সীতারাম দাস একখানি রচনা করেন, তারও ১১০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭১৩ খ্রীঃ ঘনরাম তাঁর পুথি শেষ করেন। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল সমাজে। বঙ্গবাসী প্রেস থেকে ঘনরামের ধর্মমঙ্গলই ছাপা হয়েছিল। বলা উচিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ছাপা হয়েছে ময়ূর ভট্টের ধর্মমঙ্গল বা 'অনাদিমঙ্গল'।

মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল—সবই যদি চলে, গোবিন্দ কি বাদ পড়েছিলেন? নিশ্চয় নয়। কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল বাদ পড়বার মত বইও নয়; যদিও গোবিন্দমঙ্গল ভাগবতের অনুবাদ মাত্র। অনুবাদ হলেও তার কাব্যাংশ চমৎকার—এ অনুবাদ যে স্বাধীন অনুবাদ।

কবিচন্দ্রের রচনার নমুনা—

রাধিকার প্রেমনদী রসের পাথার।
রসিক নাগর তাহে দেন যে সাঁতার॥
কাজলে মিশিল যেন নব গোরোচনা।
নীলমণি মাঝে যেন পশিল কাঁচা সোনা॥
কুবলয় মাঝে যেন চম্পকের দাম।
কালো মেঘ মাঝেতে বিজুলী অনুপাম॥

সংস্কৃত আকর গ্রন্থের যে দুইখানি অনুবাদ দেশে সকলে পড়ে বহুকাল আনন্দ পেয়েছে, এখন তাদের উল্লেখ করা যাক—তাদের নাম, কাশীরাম দাসের মহাভারত, আর কৃত্তিবাসের রামায়ণ। দীনেশবাবু লিখেছেন যে পূর্ববর্তী অনুবাদকের লেখার ওপর কাশীরাম কোন উন্নতি করতে পারেন নাই; কিন্তু অধিকতর কৃতী লেখকও ডুবে গেছেন, কাশীরাম দাসই "ধারাবাহিক ভাবে মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক।" ইনি প্রায় সাড়ে তিন শ বছরের পূর্বেকার লোক, বাড়ী বর্ধমান জেলার উত্তরে সিঙ্গিগ্রামে। যে বিপুল মহাভারত এখন এঁর নামে চলে, সেখানা সমস্তই এঁর নিজের, না, অন্য অনুবাদকেরা পরে কিছু কিছু জুড়ে দিয়েছেন, ঠিক করে নির্ণয় করা সহজ নয়; বোধ করি, এখন তা সম্ভবই নয়। সন্দেহের কারণ এই যে, দুটি ভণিতা পাওয়া গিয়েছে, সমগ্র মহাভারতের অনুবাদের সঙ্গে তার মিল হওয়া দুষ্কর। একটি হল :—

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা লিখি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥

আর একটি—মুদ্রিত মহাভারতের বনপর্বের শেষে—

ধন্য হল কায়স্থকুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব ভারত যে করিল প্রকাশ॥

কৃত্তিবাসের জন্ম কিন্তু সাড়ে চারশ পাঁচশ বছর আগে। বাংলা দেশের সর্বত্র তাঁর পুথি চলেছিল। তাঁর সম্বন্ধেও বলা চলে, কালমাহাত্ম্যে অনেকের কলমই হয়তো কৃত্তিবাসী রামায়ণের উপর পড়েছিল; কিন্তু তাতে করে যে জিনিসটি দাঁড়িয়েছে, বাঙ্গালী জাতির চিত্তগঠনে তা সাহায্য করেছে। ওড়িয়া সাহিত্যে জগন্নাথদাসের ভাগবতের যে স্থান, হিন্দি সাহিত্যে তুলসীদাসের রামচরিতমানস বা রামায়ণের যে স্থান, বাংলা সাহিত্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণের সেই স্থান। সে রামায়ণে যদি বহু লেখনীর দাগ পড়েই থাকে, তাতেই বা আপত্তি কি? বর্তমান যুগের আগে আমরা কখনও নিজেদের জাহির করতে তত ব্যস্ত ছিলাম না। কৃত্তিবাসের পরিচয়ের অন্তরালে হয়তো বহু লেখক আত্মগোপন করে আছেন। কবির নিজের পরিচয় হল এই, নৃসিংহ ওঝার বংশে এখনকার নদীয়া জেলায় রানাঘাট স্টেশন থেকে ৭ মাইল পশ্চিমে ফুলিয়া গ্রামে কৃত্তিবাসের জন্ম। কবি একটা আত্মবিবরণী লিখে গেছেন; তাতে আছে—

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তথিমধ্য জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

বিদ্যালাভ করে রাজপণ্ডিত হওয়ার আশায় তিনি সটান

গৌড়েশ্বরের রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত হন—তাঁর রাজসভায় উপস্থিত হওয়ার কাহিনী বড়ই সুন্দর। তিনি নানা ছন্দের শ্লোক পড়ে রাজাকে খুশি করেন, এবং পুষ্পমালা প্রসাদ পান। এত দিন পরেও কবির আত্মসম্মান ও বিদ্যা দুই-ই পাঠকের মনকে মুগ্ধ করে। এক জায়গায় বলেছেন—যখন রাজসভায় পাত্রমিত্রেরা পরামর্শ দিচ্ছেন, রাজ্যাধিপতির কাছ থেকে যা খুশি চেয়ে নাও, তখন তার উত্তরে—

কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥

আবার যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥

নিজের রচনা সম্বন্ধে একটুখানি গৌরববোধ ও আত্মবিশ্বাস না থাকলে এতবড় কাব্য লেখা সম্ভব হোত না। কবি আমাদের একথাও জানতে দিয়েছেন যে, রাজাজ্ঞায় রামায়ণ রচিত হয়েছিল।

কৃত্তিবাসী এই আত্মবিবরণী পড়ে আজকের দিনে সব পাঠকই নিশ্চয় খুশি হবেন।

রামায়ণের আর দুটি বাংলা অনুবাদের নাম করি। একটি লিখেছেন অদ্ভুতাচার্য। নামটা একটু অদ্ভুত অদ্ভুত রকমের ঠেকছে বটে, তবে তার কারণও আছে। লেখকের নিজস্ব নাম নিত্যানন্দ। যখন তিনি সবে সাত বছরের ছেলে, তখন এক ব্রাহ্মণের বেশে এসে রামচন্দ্র তাঁকে রামায়ণ গাইতে হুকুম

দেন। সাত বছরের ছেলে, তখনও উপবীত হয় নাই, তবু রঘুপতির আদেশ শিরোধার্য করে তিনি পয়ার প্রবন্ধে রচনা করতে আরম্ভ করে দেন—পড়াশুনা না করেও। এই জন্যই সম্ভবতঃ তাঁর নাম রটে গিয়েছিল—অদ্ভুতাচার্য। উত্তরবঙ্গে তাঁর যথেষ্ট প্রচার ছিল। মনে পড়ে, বহুদিন পূর্বে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের পুথি নাড়াচাড়া করতে করতে অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের অনেকগুলি পুথি দেখেছিলাম।

আর একটি অনুবাদের উল্লেখ করব বলেছিলাম, সেটি হচ্ছে চন্দ্রাবতীর রামায়ণ। একজন নারী কবি রামায়ণ রচনা করেছেন, এটা খুব গৌরবের কথা। কবি চন্দ্রাবতীর জীবনকথা অবশ্য ভারি বিচিত্র; ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি তাঁর জন্ম হয়েছিল—অর্থাৎ এখন থেকে চারশ বছর আগে। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার ফুলেশ্বরী নদীর ধারে চন্দ্রাবতীর বাড়ী। তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত কবি, বংশী দাস, তাঁর মনসামঙ্গল বাংলা সাহিত্যে নিজের একটা জায়গা করে নিয়েছে। পিতার কাব্যেও কন্যার কিছু কিছু হাত রয়েছে। চন্দ্রাবতী নিজের রামায়ণে যে বংশ-পরিচয় দিয়েছেন, কৃত্তিবাসের বংশ-পরিচয়ের পাশে তাকে অনায়াসে রাখা যেতে পারে। চন্দ্রাবতীর আশৈশবপ্রণয়ী চপলতার ফলে ধর্মত্যাগ করে; তবু অনুতাপের ঝোঁকে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, দেখা না পেয়ে ফুলেশ্বরীর জলে প্রাণ বিসর্জন দেয়, আর চন্দ্রাবতীর অপাপবিদ্ধ জীবন ব্যর্থপ্রণয়ের আহুতি

হয়ে শিবের বিগ্রহের সামনে লুটিয়ে পড়ে। তার পূর্বে বংশী দাস কন্যাকে নৈরাশ্যময় জীবনের উপযোগী হিসাবে রামায়ণ রচনা করতে বলেছিলেন, সীতার বনবাস পর্যন্ত রচনাও হয়েছিল, তার পরে আর অগ্রসর হয়নি—চন্দ্রাবতীর প্রাণমুকুল যে অকালেই ঝরে পড়ে গেল!

দীনেশবাবু চন্দ্রাবতীর রামায়ণকে প্রশংসা করে বলেছেন—"ইহা পল্লীবাহী নদীতরঙ্গের ন্যায় গতিশালী, সতেজ ও কবিত্বময়।"

মঙ্গলকাব্যের কথা বলবার সময় একখানি সুপরিচিত গ্রন্থের নাম করা হয়নি; সে নামের সঙ্গে আবার রামায়ণের নামেরও মিল আছে। বইখানার নাম শিবমঙ্গল বা শিবায়ন। গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য শিবপূজার প্রচার, এবং অন্যান্য মঙ্গলগ্রন্থের মতই একাধিক কবি এটি রচনা করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (আনুমানিক ১৭৬৩ খ্রীঃ) রামেশ্বর ভট্টাচার্য শিবায়ন রচনা করেন; অন্যান্য শিবায়নের মধ্যে এঁর কাব্যই সবচেয়ে পরিচিত। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের যেমন ধরণধারণ, এরও তেমনি। আমাদের দেশে 'কানু ছাড়া গীত নাই,' একথা কিন্তু পুরোপূরি সত্য নয়, কানু ছাড়া গীতও রচিত হয়েছিল।

আমাদের কাব্যপ্রাণ শুধু যে দেবদেবীদের বিষয় আশ্রয় করেছিল, রামায়ণ শিবায়ন মহাভারত গোবিন্দমঙ্গল মনসাভাসান এই সব রূপে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তা কিন্তু

নয়। নদীর ধারে ধারে চাষীদের ঘরে পণ্ডিতের পাঠশালায় গ্রামের কুটিরে নিত্যকার জীবনযাত্রার মধ্যে কত যে বস্তু রূপায়িত হয়েছিল ও হচ্ছিল, তার হিসাব কে করবে! কিছুদিন ধরে তাদের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলছে। মহুয়া মলুয়া কাজলরেখা কাঞ্চনমালা অতীতের সেই আবরণ ভেদ করে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। চন্দ্রকুমার বাবুর চেষ্টায়, দীনেশ বাবুর উৎসাহে, তার কিছু কিছু ছাপাও হয়েছে। এখনও বিস্তর উপাদান দেশময় ছড়িয়ে আছে। জসিমুদ্দীনের নকশী কাঁথার মাঠ সেই পুরানো ভঙ্গীতে তবু খানিকটা আধুনিকতা বজায় রেখে লেখবার চেষ্টা, এবং সার্থক চেষ্টা। নকশী কাঁথার মাঠে কিন্তু প্রত্যেক সর্গের বা ভাগের প্রথমে পুরানো গানের যে দুই এক ছত্র আছে, তা থেকে আমরা নতুন ও পুরানোর মধ্যে প্রভেদ যে কত বড়, তা বুঝতে পারব; জসিমুদ্দীনের কৃতিত্ব, তিনি দুটোতে জোড় দিতে পেরেছেন।

এইবার অন্য ধরণের একটি কাব্যের নাম করি—পদ্মাবতী। বাংলা ৯২৭ সনে, অর্থাৎ ১৫১৮ খ্রীঃ, মীর মালিক মহম্মদ জ্যায়সী নামে একজন কবি হিন্দীতে পদ্মাবৎ নামে একখানি কাব্য রচনা করেছিলেন, পদ্মাবৎ নামে পদ্মিনীর উপাখ্যান। চিতোরের রাণা ও আলাউদ্দীনের যে বিরোধ, তখনকার লোকে তাকে শুধু হিন্দু-মুসলমান অথবা রাজপুত-পাঠানের বিরোধের ভাবে দেখত না, তাদের মনে হত ও যেন

শুভাশুভের, পাপপুণ্যের বিরোধ। জ্যায়সী ঐভাবেই কাব্যখানি রচনা করেন। প্রায় তিনশ বছর আগে বাংলায় তার আদর্শে একখানা কাব্য হয়, নাম পদ্মাবতী। এর কবি হলেন আলওয়াল, ইনি আরাকানের রাজার প্রধান অমাত্যের আশ্রয়ে ছিলেন, এবং তাঁরই আদেশে অনুবাদ করেন। পদ্মাবতী কাব্য যাঁরা আলোচনা করছেন, তাঁরা কবি আলওয়ালের পাণ্ডিত্য ও রসবত্তার প্রশংসা না করে পারেন নি। কবির কাব্যে বৈষ্ণব কবিদের, বিশেষ করে বিদ্যাপতির ছাঁদ পাওয়া যায়; লক্ষ্য করবার কথা এই যে, মুসলমান অমাত্যের আশ্রয়ে একজন মুসলমান কবি অন্য একজন মুসলমান কবির মূল থেকে যে কাব্য অনুবাদ করেছেন, কাব্য খানিও ছোটখাট নয়, তার মধ্যে কি ভাষায় কি ভাবে কোনও সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত—

শিরে গঙ্গাধারা জটা গলে অস্থিমালা।
অঙ্গেতে ভস্ম পৃষ্ঠেতে পরন বাঘছালা॥
কণ্ঠে কালকূট ভালে চন্দ্রমা সুচারু।
কক্ষে শিঙ্গা ভূতনাথ করেত ডমরু॥
শঙ্খের কুণ্ডলী কর্ণে হস্তেতে ত্রিশূল।
ওড়ের কলিকা জিনি নয়ন রাতুল॥

পণ্ডিতেরা অবশ্য অনুমান করেন যে পদ্মাবতীর মধ্যে মুসলমানী গন্ধ আছে,—সে গন্ধ অনুদার নয়, তার প্রকাশ শুধু আরব্যরজনীর মত উদ্ভট কল্পনায়। এটা দোষের বলে

বড় মনে হয় না ; আরব্যরজনীর কল্পনার মাদকতা শিশুচিত্ত নিশ্চয় বিনা বাক্যে স্বীকার করে নেবে ; যাঁরা বয়সে প্রবীণ তাঁরাও বুঝবেন যে মানুষ সুস্থ অবস্থায় কোন বয়সেই শিশুচিত্ত হারায় না। অনুবাদকারীর কৃতিত্ব সম্বন্ধে যদি আজকালকার পাঠক কিছু সংশয় বোধ করেন, তাহলে তাঁকে মনে করতে হবে যে মূল নির্বাচনেও কৃতিত্ব কম নয় ; দ্বিতীয়তঃ, কাশীদাস কৃত্তিবাসকে আমরা 'শুধু অনুবাদ' বলে কিছু কম সম্মান দিই না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নিই ; আমাদের বাংলাদেশের সাহিত্যিক গণ্ডী তখন অন্ততঃ আরাকান পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল, এবং আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্যের বিবরণ ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক্ ও আবদুল করিম সাহেব বাংলার পাঠকদের শুনিয়েছেন। বাংলার এক প্রান্তের এই অনুবাদচর্চা সমগ্র দেশের সাহিত্যচর্চার পক্ষে কিছু কম কম গৌরবের কথা নয়।

অতীত যুগের বাংলা কাব্যের দিগ্‌দর্শন এখানেই শেষ করি। এর পর ভারতচন্দ্রের যুগ, এবং ভারতচন্দ্রকে আমি বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের অগ্রদূত বলেই মনে করি। প্রাচীন কাব্যসাহিত্যের প্রসঙ্গ শেষ করবার পূর্বে এর দুইটি আঙ্গিক নির্দেশ করব ও কবিদের রচনা থেকে কিছু দৃষ্টান্তও উদ্ধৃত করব। সঙ্গে সঙ্গে বলি, বাংলা ভিন্ন ভারতের অন্য কোনও কোনও সাহিত্যে এই দুইটি আঙ্গিক দেখতে পাওয়া যাবে ; সাহিত্যের ব্যাপারে ও-দুইটি নিখিল-ভারত-যোগসূত্র

হয়ে দাঁড়িয়েছিল কি না, তা অনুসন্ধানের বিষয় বলে মনে হয়।

দুইটির একটি হল চৌতিশা; অর্থাৎ বর্ণমালার ক্রম অনুসারে দেবদেবীর স্তব। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর থেকে দৃষ্টান্ত—

কৃতাঞ্জলি কহে কবি কালী কপালিনী।
কালরাত্রি কংকালমালিনী কাত্যায়নী॥
কাটে কাল কোটাল কর মা প্রতিকার।
কপর্দিকামিনী কিবা করুণা তোমার॥

এইরূপে খ, গ, ঘ, ইত্যাদি। কবর্গ চারটি, চবর্গ চারটি, ট ও ত প্রত্যেকে চারটি, পবর্গ পাঁচটি, ন,য,র,ল, ব, শ, স, হ, ক্ষ— লিখেছেন ত্রিশ, বলেছেন চৌত্রিশ, কারণ ঐটেই ছিল প্যাটার্নের নাম। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে কালিকার স্তুতি আছে; একেবারে ক থেকে ক্ষ। এখন পণ্ডিত ডেকে বা অভিধান দেখে এসব কথার অর্থ বুঝতে হয়, যেমন—

৯ কার বেদের নাম তুমি সে ৯ কার;
৯ পড়িলে কি হবে ৯ কি জানে তোমার।

কিংবা ঔরসে ঔদাস্য করি ঔর্বদাহে বধ।

সাধারণ লোকের পক্ষে এ সমস্তের অর্থ করা দুঃসাধ্য নয়, অসাধ্য।

এই সময়কারই ওড়িয়া কবি উপেন্দ্রভঞ্জ গোটা কাব্য রচনা করেছিলেন উড়িষ্যায়, সমস্ত চরণের আদ্যাক্ষর 'ব' দিয়ে, নাম

বৈদেহীশবিলাস। তিনি বড়ই বিখ্যাত বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর কাব্য উপভোগ করতে বিজ্ঞ ও বিদ্বদ্বর্গের বোধের বিশেষ ব্যাঘাত হয় নাই। বঙ্গাক্ষরে সামান্য উদাহরণ—

বিজয়ী বীর! বিজয় কর যিবা মিথিলাপুর।
বাহার হোই বিহার তঁহি করন্তি মুনিবর॥
বৈদেহী যে সুন্দরীব্রজে অমূল্য চূড়ামণি।
বর্ত্তমান সে ভূতভবিষ্যে নাহিঁ নোহিব পুণি॥
বশীকরণ মূর্তি ধারণ উচাটন তা চারু।
বিধিসুন্দরী পুরন্দরী যে তাঁহারু বোলিবারু॥
বিহিলা বিহি প্রভা এ কাঁহি শোভা সংগ্রহ পাই,
বনা বিবেক পণ্ডিতলোকমানংকু করি দেই॥

এই ধরণের কবিতা খানিকটা পড়লে পর আর কাউকে মনে করিয়ে দিতে হবে না যে, সেকালে কাব্য রচনায় ও কাব্য আস্বাদনে তাঁরাই অগ্রসর হতেন যাঁদের কণ্ঠে বিরাজ করত অলংকার বা সাহিত্যশাস্ত্র, ব্যাকরণ ও অভিধান। ঐ তিনটি নইলে যে শিক্ষাই সম্পূর্ণ হতনা, ভাষার ওপর দখল জন্মাত না।

এ যুগের কাব্যের অন্য আঙ্গিকটি হল বারমাস্যা। বারমাস্যা কথাটার অর্থ হল, নায়কনায়িকার বারমাসের অবস্থা—পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও মনের ভাব—একত্র এঁকে দেখানর রীতি। আলওয়ালের কাব্যে—

ভাদ্রেতে যামিনী ঘোর তমঃ অতিশয়।
নানা অস্ত্র অনিবার মদন ক্ষেপয়॥

আশ্বিনে প্রকাশ নিশি নির্মল গগন।
গৃহ অন্ধকার নাহি চাঁদের কিরণ॥
সকলের মতে চন্দ্র, রাহু মোর মতে।
মুদিত কমল আঁখি চন্দ্রিকা উদিতে॥

কার্তিকে পরব দেয়ালি ঘরে ঘরে সুখভোগ।
নিজপতি বিনে মোর ভোগ ভেল রোগ॥

ফাল্গুনে মোর অঙ্গ পরশি পবন যথা যায়।
তরুকুল পত্র ঝরি পড়য় তথায়॥
বৈশাখে বিদরে মহী অরুণ প্রবলে।
ভ্রষ্ট ভেল বায়ু জল বিরহে অনলে॥
মিত্র হইয়া কমল না সহে দিনমণি।
পতি বিনে কেমতে সহিবে কমলিনী॥

জ্যৈষ্ঠে পুষ্পরেণু চন্দন ছিটায় সখিগণ।
ভস্মবৎ হয় মোর অঙ্গ পরশন॥

মৈমনসিংহগীতিকায় মলুয়ার দুঃখের ছবি বারমাস্যায় ফুটে বেরিয়েছে—

নাকের নথ বেচ্যা মলুয়া আষাঢ় মাসে খাইল।
গলার যে মতির মালা তাহা বেচ্যা গেল॥
শায়ন মাসেতে মলুয়া পায়ের খাড়ু বেচে।
এত দুঃখ মলুয়ার কপালেতে আছে॥
হাতের বাজু বান্ধা দিয়া ভাদ্র মাসে যায়।
পাটের শাড়ী বেচ্যা মলুয়া আশ্বিন মাসে খায়॥

ফুল্লরার দুঃখও এইভাবে বারমাসে ছড়িয়ে পড়েছিল,

ব্যাধের স্ত্রীর জীবনে সে যে স্বাভাবিক ;—বৈশাখের ঝড়ে ঘর ভেঙ্গে পড়ে যায়, জ্যৈষ্ঠে বঁইচি খেয়ে উপোস করতে হয়, শ্রাবণে জোঁকের ভয় বৃষ্টিতে মাংসও বিক্রয় করা যায় না। আশ্বিনে সকলে তো প্রসাদী মাংসই খায়, তাই ব্যাধের শিকার করা মাংস কেউ আর খেতে চায় না। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, দুঃখের সংসার এই ভাবে যায় কেটে।

বারমাস্যা সব কিন্তু দুঃখেরই শুধু নয়, সুখেরও আছে। সিংহলের রাজকন্যা সুশীলার বিয়ে হয় শ্রীমন্ত সদাগরের সঙ্গে ; শ্রীমন্ত যখন দেশে ফিরতে চাইলেন, তখন সুশীলা বর্ণনা করতে লাগলেন, সিংহলে বারমাস ভরেই কত সুখ ! অত সুখ ছেড়ে কি কোথাও যেতে আছে ! ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে সুখের বর্ণনা আছে—বৈশাখে ফুল, জ্যৈষ্ঠে পাকা আম, আষাঢ়ে মেঘ, শ্রাবণে দিনরাত একাকার, ভাদ্রে জলের ঝরঝর আর বাতাসের খরখর, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালিপূজা ও রাসপূর্ণিমা, অগ্রাণে সদ্যোঘৃত সদ্যোদধি সহযোগে নবান্ন—এই ভাবে বারমাসের সুখ। আমরা কি আজকাল আমাদের বারমাসের সুখদুঃখ হিসাব করে এই ভাবের কবিতা রচনা করতে পারি না ? সে কালের আঙ্গিককে তাহলে আরও স্পষ্ট করে দেখতে পারি।

পঠনীয় :—দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

মুহম্মদ এনামুল হক্ ও আবদুল করিম—আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য

আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

৫

পূর্বেই বলেছি, ভারতচন্দ্রকে আমরা নবযুগের অগ্রদূত বলে মনে করতে পারি। সাহিত্যের পরিবর্তনের কথা সাধারণ ভাষায় সংক্ষেপে এভাবে বলতে হয় বটে, কিন্তু সে ভাবে কথা বলার বিপদও আছে—লোকে ভুল বুঝতে পারে। তবু সংক্ষেপে বলতে হয়। সূত্রকার অবশ্য একথা বলতে পারেন—

শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

কথা বললে শোনায় ভাল, কিন্তু তাতে জ্ঞান বিশেষ বাড়ে কিনা সন্দেহ। যখন সমস্তটা জানলে বুঝবার ভুল হবে না, তখন মনে করে রাখার দিক দিয়ে সংক্ষেপোক্তি সুবিধাজনক। ভারতচন্দ্র কেন নবযুগের অগ্রদূত, সে কথাটা তাই ঠিক ঠিক বুঝতে হবে।

কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রের প্রধান গ্রন্থ অবশ্য অন্নদামঙ্গল। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত এরও প্রতিপাদ্য বিষয়, অন্নদার পূজা সংসারে প্রচলিত করা। তার মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বসিয়ে দেওয়া আছে। অন্নদামঙ্গল ছাড়া ইনি কাশ্মীর-কবির চৌর পঞ্চাশতের দুধারার অর্থ বজায় রেখে অনুবাদ

করেছিলেন, কিছু খুচরো কবিতাও রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে পণ্ডিত, রসিক, কবি। আমাদের কাছে তাঁর কাব্যচাতুরী প্রধানতঃ বিদ্যাসুন্দরের মধ্য দিয়েই এসেছে।

বিদ্যা ও সুন্দর শাপভ্রষ্ট দেবতা। এখানকার অত্যাচার অবিচারের পর তাঁরা স্বর্গেই ফিরে যাবেন। ভারতচন্দ্র স্বপ্নে দেবীর আদেশ পেয়ে তবে কাব্যরচনায় হাত দিয়েছিলেন, এবং দেবীর বরই তাঁকে কবি হবার সামর্থ্য দিয়েছিল। সে কথা কবি কৃতজ্ঞ অন্তরে গ্রন্থারম্ভে লিখে গেছেন। মঙ্গলাচরণ প্রভৃতি অঙ্গের কথা ছেড়েই দিই—ও-সব মামুলি ব্যাপার, অন্যান্য মঙ্গল গ্রন্থের মতই। কবিকংকণের মঙ্গলচণ্ডীর সঙ্গে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের মিল আছে; ভারতচন্দ্রের প্রতি অপ্রীতিবশেই সম্ভব, কেউ কেউ তাঁকে কবিকংকণের নকলনবিশ পর্যন্ত বলেছেন! অনেকে উভয়ের তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন। তবে ভারতচন্দ্রের আধুনিকতাটা কোথায়?

আধুনিকতাটা দেখা দিয়েছে দুই আকারে—সাহিত্যের বস্তুর মধ্যে, ও তার রূপের মধ্যে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের চেয়ে অন্নদামঙ্গলে ঐহিকতার মাত্রা বেশি। বিদ্যাসুন্দরের ব্যাপারটা আসরটা যেমন জমকালো করে রেখেছে, তাতে তাকে গৌণ বলা যায় না; বরং বলতে হয়, অন্নদামঙ্গল ফ্রেম বটে, আদিতেও আছে আবার অন্তেও নিশ্চয় আছে, তবু মাঝের ঘটনাটা বেশ ঝকঝকে-তকতকে। পালিশটা 'মডার্ণ'—কথা বলার, রচনা করার আঁটসাট মোটেই সেকেলে নয়।

আর ছন্দের দিক? ভারতচন্দ্রের ছন্দ দেখুন; বাংলা কাব্যে অনেক অভিনব ছন্দ তাঁর দান। "ওহে বিনোদ রায়, ধীরে ধীরে যাও হে," "অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে," প্রভৃতি দেখে মনে হয় সংস্কৃত ভাষার আর খাঁটি বাংলার কত রকমের ছন্দ তাঁর একেবারে আঙ্গুলের ডগায় থাকত। সংস্কৃতের সঙ্গে তাঁর রচনার যোগ যে কত ঘনিষ্ঠ ছিল তার দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি চরণ উদ্ধৃত করি, বেমালুম সংস্কৃত পদ গোটা গোটাই তাতে বসিয়ে দিয়েছেন, যেমন—

জয় পুনীহি ভারত মহীশ ভারত উমেশ-পর্বতসুতাবর ;—

আবার দেশী খাঁটি বাংলা পদও আছে—

পাকা গোঁপ পাকা দাড়ি পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি
চলনে করেন আঁটুবাটু।

অন্যত্র আমার উমা মেয়ের চূড়া, ভাঙ্গড় পাগল ঐ না বুড়া,
ভারত কহে পাগল নহে ঐ ভুবনেশ্বর লো।

সুতরাং সাহিত্যের রূপ আর বিষয়বস্তু, দুটো দিক দিয়েই ভারতচন্দ্রকে আমরা আধুনিকতার অগ্রদূত বলতে পারি। 'গুণাকর' উপাধিটি তাঁর পক্ষে বেমানান হয়নি। আর ভারত-চন্দ্রের প্রভাব, তাঁর ক্ষমতা, এ থেকেও বেশ বুঝতে পারা যায়, যখন মনে করি যে প্রায় আমাদের সময় পর্যন্ত তাঁর কবিতা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য এই নিয়ে ঘোর বিতণ্ডা উপস্থিত হয়েছিল, যেদিন কোনও বই ছাপানো আমাদের দেশে তেমন চালু হয় নি সেদিনও তাঁর কবিতার বিভিন্ন সংস্করণ ছাপা হয়েছিল!

ভারতচন্দ্র যে সুরে ঘা দিলেন, সে সুর কলকাকলীর সৃষ্টি করল। ছন্দের বৈচিত্র্য, গানের ভাণ্ডার, যেন স্বতঃ উৎসারিত হয়ে উঠল। কবি, পাঁচালী, হাফ আখড়াই, নানা ছন্দে নানা বন্ধে গীতিকবিতা পল্লবে পল্লবে উঠল বিকশিত হয়ে। রাম বসুর কবি, দাশরথি রায়ের পাঁচালী, রামপ্রসাদের গান, নিধুবাবুর টপ্পা—এই অনুবন্ধ আমাদের নিয়ে আসে ঈশ্বরগুপ্তের হাসির কবিতার মধ্য দিয়ে একেবারে বঙ্কিমী যুগ পর্যন্ত। তার পর রবীন্দ্রযুগেও কি তার রেশ খুঁজে পাওয়া যায় না? গানের রাজত্ব বাঙ্গালীর সেদিন থেকেই আরম্ভ হয়েছে, যেদিন অন্নদামঙ্গল রচিত হল।

কবিওয়ালা পাঁচালীওয়ালার গান লোকে আজকালকার মত ছাপার হরপে বইয়ে পড়ত না, সে গান তারা শুনত, আর অমনি তা তাদের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করত। এখনকার দিনে তাদের গানের সে আকর্ষণী শক্তি কি ফুরিয়ে গেছে? কে বলবে সে কথা?

পুরানো একটা গান এখানে উদ্ধৃত করা যাক—

হৃদিবৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি।
ওহে ভক্তিপ্রিয়, আমার ভক্তি তবে হবে তব রাধা সতী॥
মুক্তি কামনা আমারি হবে বৃন্দা গোপনারী,
আমার দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী।
ধর ধর জনার্দন পাপভার গোবর্দ্ধন
কামাদি ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রতি॥

বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী, মন ধেনুকে বশ করি,
গোষ্ঠের সাধ কৃষ্ণ পূরাও, পদে তোমার এই মিনতি ॥
প্রেমরূপ যমুনার কূলে আশাবংশীবটমূলে
দাস ভেবে সদয় হয়ে সদায় কর বসতি।
যদি বল সে রাখাল-প্রেমে, বদ্ধ আছ ব্রজধামে.
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার 'দাস' হতে চায় দাশরথি ॥

কল্পনায় যেন দেখতে পাই—এভাবে দাশরথি গান গাইছেন, রাত অনেক হয়ে গিয়েছে, দেখতে শুনতে গানের পালায়ও অনেক অসঙ্গতি আছে, কিন্তু সে সব এড়িয়ে পণ্ডিতমূর্খ নির্বিশেষে সকলে নিমেষহারা হয়ে এই গান শুনছে, আর নিত্যকার শোনা রাধাকৃষ্ণের অমৃতময়ী লীলা এরই ভাষায় বুঝে তারা নতুন করে আনন্দ পাচ্ছে। আবার তার সঙ্গে সঙ্গেই শুনি, সাধক রামপ্রসাদ মায়ের নামে বিভোর হয়ে মায়ের উপর জবরদস্তি করে বলছেন—

কালী ভেবে কালী হয়ে কালী বলে কাল কাটাব।
আমি কালাকালে কালের মুখে কালী দিয়ে চলে যাব ॥

গানের স্রোতে বাঙ্গালীর জীবন তখন ছিল ভাসমান—যাঁরা প্রেমের সঙ্গীত গাইতেন তাঁদেরও ভাবে কোন শিথিলতা ছিল না। নিধুবাবুর গানের ভাষা ছিল মজবুৎ, ভাবে পোরা।

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই, তোমা বিনে আর জানি নে ॥

প্রায় ঐ সময়েই কবি ঈশ্বরগুপ্তের আবির্ভাব—তিনিও গানের ও ছড়ার ধরণে এবং নানা বিষয় অবলম্বন করে, অজস্র কবিতা লিখতে লাগলেন। তার একটা নমুনা হল—

ওমা কুইন, তোমার ইণ্ডিয়া ধাম রুইন কোরো নাকো।
আমরা সব পোষা গরু, তুমি মা কল্পতরু, শিখিনি শিং বাঁকানো ঢং।
আমরা ভূষি পেলেই খুশি রব, ঘুষি খেলে বাঁচবনা॥

ভারতচন্দ্র থেকে ঈশ্বরগুপ্ত পর্যন্ত একটানা ছুটেছে গানের প্রবাহ—যা কি না বঙ্কিমের যুগে রূপায়িত হয়ে গিরিশচন্দ্রের নাটকে ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অভিনব সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে বাঙ্গালীকে তথা ভারতকে ও জগৎকে গীতিকবিতায় ধনী করেছে। বাঙ্গালীর ছন্দকুশলী কবি সত্যেন্দ্রনাথ যে গেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে—

জগৎকবিসভায় মোরা তোমার করি গর্ব।
বাঙ্গালী আজি গানের রাজা, বাঙ্গালী নহে খর্ব॥

—তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল অন্ততঃ ভারতচন্দ্রের সময়, সেই সময় থেকে যেন রাগিণীর বান একটানা ছুটে এসেছে।

কিন্তু আমরাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছি খুবই দ্রুত; একটু থেমেই দেখা যাক।

ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছিল মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায়; প্রভুর প্রতি বিনয় জ্ঞাপন করতে গিয়ে কবি বলেছেন যে, কৃষ্ণচন্দ্র যা বলেছেন ভারতচন্দ্র রচনা করতে বসে তা-ই লিখেছেন। সেই কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে বাংলা দেশে

ইউরোপীয়েরা এদেশী ভাষা ও সাহিত্য শিখতে ও তাই নিয়ে রচনা করতে আরম্ভ করে দিল। ১৭৪৩ খ্রীঃ ঢাকা জেলার ভাওয়াল থানায় পোর্তুগীস পাদ্রি মানোয়েল-দা-আস্‌সুমস'াও বাংলা শব্দকোষ ও বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন, অবশ্য পোর্তুগীস ভাষায়, এবং তাঁরই স্বদেশী ও স্বধর্মীদের জন্য, যাতে পোর্তুগীস প্রচারকেরা এদেশে এসে সহজে এদেশের ভাষা শিখে নিয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে পারেন। এর কয়েক বছর পরেই পলাশীর যুদ্ধ, এবং তাতে নবাব সিরাজদ্দৌলার হার ও ইংরেজের জয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এদেশের শাসনভার ইংরেজের হাতে এসে পড়ল। ইংরেজ দেখল, দেশ শাসন করতে গেলে দেশের ভাষার জ্ঞান থাকা চাই। পূর্বে ছিল ধর্মপ্রচারের জন্য ভাষাজ্ঞানের আবশ্যকতা, এখন দ্বিতীয় কারণ এসে উপস্থিত হল। অবশ্য অন্যদেশের ভাষা শেখার তৃতীয় এক কারণ আছে —প্রয়োজন ছাড়াও শুধু জ্ঞানের জন্য লোকে বিদেশী ভাষা ও সাহিত্য শিখে থাকে। পলাশীর যুদ্ধের প্রায় কুড়ি বৎসর পরে হালহেড বলে একজন ইংরেজ, সম্ভবতঃ জ্ঞানের জন্যই, বাংলা ভাষা শিখে ইংরেজিতে একখানা বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন, এবং তার নাম দেন সংস্কৃত ঢং-এ—"বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং ফিরিঙ্গীনামুপকারার্থং ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী।"

কিছু কাল থেকে, সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজ শাসনতন্ত্র বুঝতে পারছিল যে এদেশ ভাল করে শাসন করতে গেলে এদেশের ভাষা, সমাজ, এদেশের ন্যায় ও আচার, সবই বুঝে নেওয়া

দরকার। সুতরাং যারা দেশ শাসন করবে সেই রাজকর্মচারীদের এ সমস্ত শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে। মানুষ এতাবৎকাল তার ভাষা দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে এসেছে; এদেশের বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য তাই বিদেশী রাজকর্মচারীদের অবশ্যপাঠ্য হয়ে উঠল। কয়েক বৎসর ধরে জল্পনা কল্পনা চলতে লাগল; তারপর ১৮০০ খ্রীঃ ইংরেজ সরকার একটি শিক্ষায়তনই খুলে ফেললেন—অবশ্য সাধারণের জন্য নয়, যে সব তরুণ ইংরেজ বিলেত থেকে চাকরী পেয়ে এদেশে আসবেন, তাঁদেরই এদেশী বিদ্যায় শিক্ষাদানের জন্য। নতুন শিক্ষায়তনের নাম হল 'কলেজ অফ্ ফোর্ট উইলিয়ম'; তখন সমস্ত বাংলা দেশটার 'ফোর্ট উইলিয়ম' এই ইংরেজি নাম ছিল, আর সে বাংলার সীমা বহু দূরে দেশান্তর অবধি বিস্তৃত ছিল।

বাংলা পড়ান তো হবে, কিন্তু কি পড়ান হবে, বই কই? কয়েক বৎসর ধরে বইয়ের ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা চলছিল। উইলিয়ম কেরি এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করবার জন্য এসেছিলেন; কিন্তু ধর্মপ্রচার করতে হলে এদেশের ভাষাও যে জানা চাই, নইলে তাঁর কথা শুনবেই বা কে, আর বুঝবেই বা কে? তাই তাঁকে বাংলা, সংস্কৃত ও এদেশী অন্যান্য ভাষা শিখতে হয়েছিল। বলে রাখা উচিত যে ভাষা শিখবার তাঁর একটা সহজাত ক্ষমতা ছিল। তিনি বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন। বাংলা ভাষার ও অন্যান্য বহু ভাষার ব্যাকরণ-অভিধানও তিনি রচনা করেন। তাঁকে কলেজ অফ ফোর্ট উইলিয়ম-এর বাংলা

ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক করে নেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে অনেক কয়টি বাঙ্গালী পণ্ডিত ও দুই একজন ইংরেজ সহযোগী থাকলেন। বাংলা বই দুইটি একটি করে আস্তে আস্তে রচিত ও মুদ্রিত হতে লাগল। তরুণ কর্মচারীদের শিখতে হবে বাংলা ভাষার সাধারণ প্রয়োগ, অর্থাৎ কি না গদ্য বাংলা ; চলতি বাংলাও বটে। তার জন্য কেরি সাহেব লিখলেন Dialogues বা কথোপকথন, যেমন করে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা, মাঝি মাল্লারা, জেলেরা, কথা বলে, তার সংগ্রহ ; এর খুবই দরকার ছিল, কারণ কর্মচারীদের দেশের লোকের সঙ্গে কথা বলতে হত। বিদেশী ভাষা শিখতে হলে ব্যাকরণ, শব্দকোষ, পাঠমালাও চাই ; কেরিকে তাও জোগাতে হয়েছিল। সহযোগীরা বই লিখতে আরম্ভ করলেন, বইয়ের অভাব মেটাবার জন্য। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনী, প্রতাপাদিত্যের চরিত-কথা—এ ধরণের বইও লেখা হল। মনে রাখতে হবে, এসব মুখ্যতঃ বিদেশী ইংরেজের প্রয়োজনে রচিত বই হলেও আমাদের এ সমস্তের খুবই অভাব ছিল। এর পূর্বে ছয় সাত শ বছর ধরে আমরা সাহিত্য সৃষ্টি করে এসেছি, সাহিত্য চর্চা করে এসেছি, সুতরাং ভাষায় কথা কয়েছি লিখেছি, তবু কখনো সে ভাষায় ব্যাকরণ লিখবার, সে ভাষায় শব্দ সংগ্রহ করবার, সে ভাষায় জীবনী বা ইতিহাস লিখবার প্রয়োজনও বোধ করি নি, ওসব কাজ হয়ও নি আমাদের দিয়ে। ব্যাকরণ আর অভিধানের ব্যাপারে সংস্কৃতেরই অবলম্বনে পড়াশুনা

করেছি, আর জীবনী বা ইতিহাস লিখেছি সম্ভবতঃ ঐ সংস্কৃতেরই প্রভাবে—ছন্দোবন্ধে, অর্থাৎ কি না কাব্যে। এখন নতুন ঢং-এ ইংরেজ কর্মচারীদের জন্য বই লেখা হলেও এতে করে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের একটা দিকের প্রকাণ্ড অভাব পূর্ণ হল। অবশ্য এখানে একটা কথা বলা দরকার ; বাংলা গদ্যের কথিত ছাড়া লিখিত প্রয়োগও যে ছিল, তার প্রমাণ সহজিয়া বা ঐ জাতীয় বিবিধ পুথিতে পাওয়া যায়, আরো দু-এক-জায়গাতেও সন্ধান মেলে—প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন নামে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে গ্রন্থ বেরিয়েছে, তাতেও এর প্রমাণ ও নিদর্শন পাওয়া যাবে যথেষ্ট। যেদিন বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল, সেদিন কলেজ অফ্ ফোর্ট উইলিয়মের প্রকাশিত গ্রন্থমালার উপযোগিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কর্তৃপক্ষ সকলেই বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। বলে রাখা দরকার যে ১৮৫৪ পর্যন্ত এই কলেজ অফ্ ফোর্ট উইলিয়ম বেঁচে ছিল।

অল্প দিনের মধ্যেই কিন্তু বাংলা গদ্যে নানা প্রকারের গ্রন্থ বের হতে শুরু করল। কলেজ অফ্ ফোর্ট উইলিয়মের প্রতিষ্ঠার বছর পনেরর মধ্যে বেরোল বাংলায় সংবাদ-পত্র—শ্রীরামপুরের মিশনারীদের সমাচার-দর্পণ ; গ্রন্থ নয় অবশ্য, তবে গদ্যকে সচল ও প্রকাশক্ষম করার পক্ষে এমন উপায় আর নাই। সমাচার-দর্পণের সাহায্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সমাজের রূপ ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা অনুসন্ধিৎসুরা করেছেন ও করছেন। এদিক থেকেও সমাচার-দর্পণের নাম

হয়তো বাংলা সাহিত্যে থেকে যাবে। তারপর প্রতি দশ বৎসরের মধ্যে এক এক খানা বাংলা কাগজ, অন্ততঃ বাংলা দেশের কাগজ, তার ছাপ রেখে গেছে আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে। সেই সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্যেরও এক এক রূপ খুলে গেছে। সমাচার-দর্পণের আবির্ভাব হল উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে; তার পরের দশকে একদিকে রামমোহন, অন্যদিকে ভবানীচরণ, উভয় পক্ষের বাগ্‌বিতণ্ডায় ও শাস্ত্র-তর্কে, সমাচারচন্দ্রিকা প্রভৃতি কাগজের গদ্যে ও ভাবে, তখনকার সমাজের একদিককার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। পরের দশকে কবি ঈশ্বরগুপ্তের সংবাদ-প্রভাকর শুধু সংবাদের ব্যাপারে নয়, নব নব ভাবনায় দীপ্ত; বাংলা সাহিত্যের, পুরোনো সাহিত্যের রচনা নতুনভাবে অনুসন্ধানের ফলে (যার তিনি নাম দিয়েছিলেন গুপ্তরত্নোদ্ধার), সেই কর্মরত কবি নানাদিকে একটা গতি এনে দিলেন। আবার দশ বছর না যেতেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আবির্ভাব। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, এঁদের বহুমুখী চিন্তা ও সবল ব্যক্তিত্বের ছাপ বুকে ধরে তত্ত্ববোধিনী বহুদিন ধরে বাঙ্গালীর চিন্তাজগৎকে বেশ একটা নাড়া দিয়ে গেল। ধর্মবিষয়ে, সামাজিক বিষয়ে, দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে, সাহিত্যবস্তু নিয়ে, যে সব রচনা বাংলায় লেখা যেতে পারে, বাঙ্গালী ক্রমে শিখল, তা পড়তে ও তার আদর করতে, তারপর সেই সব আলোচনায় যোগ দিয়ে

নিজেরও বাংলা গদ্য লিখতে। তত্ত্ববোধিনীর পরের দশকে হিন্দু পেট্রিয়ট, তার পরের দশকে তেমন কিছু না হলেও তার পরের দশকে বঙ্গদর্শন—এমনি করে দেখান যেতে পারে যে প্রথম সত্তর বৎসর ধরে বাংলা সাময়িক সাহিত্যের অগ্রগতি সরল রেখায় হয়েছিল।

কিন্তু এখনও বাংলা গদ্যে ধর্মশাস্ত্র বা দর্শনের আলোচনা নিয়ে যে গ্রন্থ-রচনা চলছিল সে খবর দেওয়া হয় নাই। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রাজা রামমোহন রায়ের দার্শনিক আলোচনা গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হয়ে পাঠকদের সামনে এসে উপস্থিত হল। রামমোহন কেতাবী পড়ুয়া মাত্র ছিলেন না; তিনি চাইতেন সমাজের প্রত্যক্ষভাবে উন্নতি সাধন করতে, আর সে জন্য বিশুদ্ধ ধর্মের বা জ্ঞানের উপাসনা যেমন ভাবে চেয়েছিলেন, তেমনি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা পরস্পরের ধর্ম জেনে পরস্পরের নিকটে আসুক, এ-ও ছিল তাঁর কাম্য। উপনিষদের তর্জমা, ধর্মশাস্ত্রের বিচার, শিক্ষার প্রচার, বিজ্ঞানের চর্চা, এসবই তিনি চেয়েছিলেন, এবং তিনি বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে তাঁর চর্চার ফল রেখে গেছেন—যদিও তখনকার দিনে লেখার পরিমাণ এখনকার তুলনায় অনেক কম ছিল (অবশ্য এতে করে লেখার গুণের কিছু লাঘব হয় না), এবং এখনকার কালের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি প্রভৃতি অনেক কিছুরই অংকুর তাঁর চিন্তা ও লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। রামমোহনের গান তাঁর আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া আজকাল

প্রায় একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে ; কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে এক সময়ে এই সব গানও এক বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে। 'মনে কর শেষের সেদিন ভয়ংকর, অন্যে বাক্য কবে, তুমি রবে নিরুত্তর'—এ নিয়ে আমরা আজ হাসি-ঠাট্টাও করি, তবে কি না তাতে করে তার ঐতিহাসিক মূল্য কমে না।

রামমোহনের বাংলা গদ্য রচনার ভঙ্গী ছিল দৃপ্ত। এখনকার তুলনায় তার ব্যাকরণঘটিত শব্দঘটিত পার্থক্য চোখে বা কানে ধরা পড়ে, কিন্তু তাতে করে তার গাম্ভীর্যের হানি কিছুমাত্র হয় না।

ঈশ্বরগুপ্তের হাসির কবিতা ও তাঁর সংবাদ-প্রভাকরের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি ; কিন্তু তাঁর কীর্তি এই দুটিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলা গদ্য রচনা, বাংলা কবিতা রচনা ও তার বিচার, বিবিধ ছন্দে লিখতে অভ্যাস করা, ইংরেজি কবিতার ছন্দ বজায় রেখে বাংলায় তার অনুবাদ, পুরানো বাঙ্গালী কবিদের আলোচনা ও যে সমস্ত কবিতা বা গান লোপ পেতে বসেছে তাদের উদ্ধার ও সংগ্রহ—এ সমস্ত দিকে তাঁর খুবই দৃষ্টি ছিল, আর শুধু দৃষ্টি নয়, পুরস্কার দিয়ে প্রশংসা করে নাম ও রচনা কাগজে ছাপিয়ে দিয়ে কত রকমে তিনি নবীন লেখকদের উৎসাহ দিতেন। এখন থেকে একশ বছর আগের লোক তিনি, তবু তাঁর দৃষ্টি কেমন উদার, তীক্ষ্ণ ও সতেজ ছিল, সে কথা মনে করে অবাক হতে হয়। আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর স্বরূপ এখনও সমগ্রভাবে ধরতে

পারি নাই। অবশ্য তাঁর অনুপ্রাসবহুল বাক্যভঙ্গী আজকার যুগে চলে না।

ঈশ্বরগুপ্ত কবিতা লিখেছিলেন, গদ্য লিখেছিলেন সংবাদপত্রে, আর তা ছাড়া লিখেছিলেন নাটক। এই কথাটি শুনে অনেকেরই খুব অদ্ভুত লাগবে, যদি তাঁরা নাটক লেখার ব্যাপারটি না জানেন। ঈশ্বর গুপ্ত নাটক লিখেছিলেন, কিন্তু নাট্যকার নন; অর্থাৎ, তাঁর 'নাটক' আমরা আর নাটক বলে স্বীকার করি না। তার পাত্রপাত্রী রূপক, অর্থাৎ মানুষ নয়, নানা প্রকার গুণ বা বৃত্তি—যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শম, দম ইত্যাদি; এ নাটক ছিল ত্রিপদী কবিতায় রচিত, আর তা অভিনয়ের জন্য লেখা হয় নি, পড়বার জন্য লেখা হয়েছিল; সংস্কৃত ভাষায় এই ধরণের নাটক—যা দৃশ্য কাব্য নয়, শ্রব্য কাব্য—তা আছে। ঈশ্বরগুপ্ত সেই আদর্শেই লিখেছিলেন।

বাংলায় দৃশ্যকাব্য কতদিন থেকে আছে তা বলা কঠিন; চৈতন্যদেব দৃশ্যকাব্যের খুব অনুরাগী ছিলেন, অনেক কৃষ্ণকথা তাঁকে নাটকাকারে শোনানো হত। তার আগেও নিশ্চয় মানবস্বভাবসিদ্ধ অভিনয়প্রীতি বাঙ্গালী সাধারণকে নাটকের ভক্ত করে রেখেছিল। যাত্রাগান এ দেশে চলতি ছিল। ইংরেজ ১৭৫৭-এর পরে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের পরে এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে; দেশশাসন উপলক্ষ্যে ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ড থেকে বহু লোকের এদেশে সমাগম হয়। তাদের চিত্তবিনোদনের জন্য কোম্পানীকে ইংরেজি রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থা এখানে করতে

হয়েছিল। আঠার শতকের শেষভাগে লেবেডেফ নামে একজন রুষদেশীয় লোক এদেশী পণ্ডিতদের সাহায্যে দুখানি হাস্যরস-বহুল ইংরেজি নাটক বাংলায় তর্জমা করে অভিনয় করিয়েছিলেন। খুব ভিড় করে দর্শকেরা অর্থব্যয় করে উপস্থিত হয়েছিলেন। দেশের লোকের মনে রসধারা যে অব্যাহত ছিল, তা এই দুটি নাটকের অভিনয়-বিবরণী হতে খানিকটা অনুমান করা যায়। ইংরেজি নাটক অভিনয় করবার চেষ্টা ক্রমে আমাদের দেশে বাড়তে লাগল। ঐ যে পুরানো যাত্রার মত করে নয়, দৃশ্যপটের সাহায্যে, নানা নতুন উপায়ে দর্শকের মন কাড়বার চেষ্টা, তখনকার মত ওতেই লোকের মন ভিজল। ব্যাপারটা যে অভিনব; সংসারে যেমনটি যেভাবে ঘটে, তেমনটি সেই ভাবে ঘটান—হুবহু জীবনের অনুকরণ! বড় বড় লোকের বাড়িতে রঙ্গমঞ্চ বসল, অভিনয় করবার মহড়া চলতে লাগল। প্রায় সোয়াশ বছর আগে, এখন যেখানে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো, সেখানে মহাধূমধামে নবীনকৃষ্ণ বসুর বাড়ি বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হয়। নামে যাত্রা, কাজে কিন্তু বিলেতি অভিনয়ের অনুকরণ! অনেক লোক নিমন্ত্রণ পেয়ে এলেন, অনিমন্ত্রিতদের জন্য এ অভিনয় যে নয়! এই যাত্রার স্মৃতি আমাদের দিন পর্যন্ত লোকপরম্পরায় চলে এসেছে। রাজসভা, মালিনীর মালঞ্চ, বিদ্যার শয়নঘর, মশান—সব পৃথক্ পৃথক্ জায়গায় ব্যবস্থা করা হয়েছিল, দৃশ্যপটের সাহায্যে রাজসভাকেই মশানে রূপান্তরিত করা হয় নাই। এক এক দৃশ্যের শেষে

অভ্যাগতেরা স্থান পরিবর্তন করে অন্য জায়গায় গিয়ে দেখতে বাধ্য হলেন। মশানে জলঝড় দেখাবার সময় বৃষ্টির পরিবর্তে গোলাপজলের ধারা বর্ষণ করা হয়, বজ্রপাতের শব্দ শোনাবার জন্য বিলেত থেকেও নাকি যন্ত্রবিশেষ আনা হয়েছিল! এত আড়ম্বরে আয়োজন করার জন্য নবীন বসুকে সর্বস্বান্ত হতে না হোক, বেশ কিছু খরচ করতে হয়েছিল। তাতে ফল এই দাঁড়াল যে, নতুন ধরণের যাত্রা বা থিয়েটার করতে দেশের ধনাঢ্য লোকেরা কিছুদিনের জন্য বেশ একটু ভয় পেয়ে গেলেন, দমে গেলেন।

কিন্তু নতুন ফ্যাশান এসে গেছে দেশে, তা লোকের মনও হরণ করেছে, সুতরাং দেশের ধনাঢ্যরা পিছিয়ে থাকতে পারেন না। তা ছাড়া, রঙ্গমঞ্চ স্থাপনে দুটো প্রবৃত্তি চরিতার্থ হোল; এক, প্রকৃতই সমাজের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা; দুই, বড়মানষি বা সামাজিকতা দেখান। গ্রীক, স্পেনিয়ার্ড, ফরাসি, ইংরেজ—এদের উন্নতির যুগে যুগে অভিনয় ও রঙ্গ-মঞ্চেরও উন্নতি হয়েছিল, সুতরাং আমরাও যদি উন্নতি করতে চাই, তবে আমাদেরও অভিনয় ও রঙ্গমঞ্চের উন্নতি সাধন করতে হবে। গেরুয়া পরলে বৈরাগ্য হয়, না বৈরাগ্য হলে গেরুয়া পরতে হয়, সেটা অবশ্য পরে বিবেচ্য। আপাততঃ গেরুয়াটাই হোক। আর, নতুন ধরণের অভিনয়ে শহরের গণ্যমান্যদের ডাকাতে হয়, সাহেবসুবোরাও বাদ যান না—তা ছাড়া বড়-মানুষদের বড়মানষি তো দোষের নয়! এই

সব কারণে, যেমন বলেছি, কলকাতা শহরের ধনাঢ্যদের বাড়ি অর্থাৎ রাজা-রাজড়াদের বাড়িতে বাড়িতে রঙ্গমঞ্চ বসান হল।

পাইকপাড়ার রাজাদের কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। কারণ, তাঁদের রঙ্গমঞ্চে অন্ততঃ দুজন বড় নাট্যকারের প্রথম নাটক অভিনীত হয়। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন দেশী বিষয় নিয়ে দেশী ঢং-এ নবীন শ্রোতাদের উপযোগী করে নাটক রচনা করতে পেরেছিলেন, তাঁর 'কুলীন কুলসর্বস্ব' বাস্তবিকই শ্রোতাদের খুশি করতে পেরেছিল। আবার ব্যাপার দাঁড়াল এই যে, রামনারায়নকে উপলক্ষ্য করেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা নাট্যশালায় পদার্পণ করেন ও বাংলা নাট্যরচনায় হাত দেন। পূর্বে বলেছি যে সাহেসুবো অর্থাৎ যারা বাংলা বুঝত না, তাদেরও অভিনয় দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হত। তাদের বোধোদয়ের জন্য কর্তারা একটু ব্যবস্থা রাখতেন, যে-নাটকের অভিনয় করা হবে তার মোটামুটি ইংরেজি তর্জমা-গোছের একটা খসড়া করিয়ে রাখতেন, সেইটে দেখে তারা অভিনয়ের বস্তু ও গতি বুঝতে পারত।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রামনারায়ণ পণ্ডিত মহাশয়ের রত্নাবলী নাটকের ইংরেজি করতে গিয়ে বলেছিলেন যে ও-সব নাটক নাটকই নয়; চাই নতুন ধরণের বাংলা নাটক, যা কিনা সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রকার বিশ্বনাথ কবিরাজের আইনকানুন বিধি-নিষেধ না মেনে নিজের স্বতন্ত্র পথে চলবে। কথায় কথায় তাঁর উপরেই এই নতুন ধরণের বাংলা নাটক রচনার ভার পড়ে,

এবং তিনি প্রথমে শর্মিষ্ঠা নাটক লেখেন। মধুসূদন আমাদের সাহিত্যে নবযুগের কাব্যরচয়িতা, মহাকবি, কিন্তু সে প্রসঙ্গ পরে হবে, এখন নাট্যকার হিসাবেই তাঁর প্রতিভার কথা বলি। তাঁর পূর্বে রামনারায়ণ, রামনারায়ণের পূর্বে হরচন্দ্র ঘোষ, তারাচরণ শিকদার, আরও পূর্বে নন্দকুমার রায় নাটক রচনা করেছিলেন, সংস্কৃত ঢং-এ, বিদেশী ঢং-এ, কিন্তু সে রচনা সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে না। নন্দকুমারের শকুন্তলা ছাড়া অন্য নাট্যকারদের নাটক অভিনয়ও হয় নি; অবশ্য রামনারায়ণের নাটক হয়েছিল, যে জন্য লোকে তাঁকে জানতই 'নাটুকে রামনারায়ণ' বলে। মধুসূদনের পদ্মাবতী আবার অন্য ধরণের নাটক; তাঁর কৃষ্ণকুমারীও বিয়োগান্ত ও ঐতিহাসিক। বিয়োগান্ত নাটকের রচনা তখন রীতি ছিল না, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবে! অথচ শেকসপীয়রের নাটকের মধ্যে বিয়োগান্ত নাটক বা ট্রাজেডিই হল প্রধান। শিক্ষিত সমাজ চাইছিলেন সেই ধরণের নাটক। মধুসূদনের প্রহসন দুখানিও অতি সুন্দর, এবং সম্পূর্ণ নতুন ধরণের—একেই কি বলে সভ্যতা, আর, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া। ইংরেজ কবি গোল্ডস্মিথের সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, He touched nothing which he did not adorn—যা তিনি ছুঁয়েছিলেন তা-ই অলংকৃত হয়েছিল; মধুসূদনের সম্বন্ধেও তাই, যাতে হাত দিয়েছেন, তাই নতুন ধরণের। নাট্যকার হিসাবে মধুসূদন বাস্তবিকই অনেক কিছু করে গেলেন; নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ, যা আজকাল পুরানো হয়ে গেছে,

তার তিনিই প্রবর্তন করে গেছেন। অবশ্য বলে রাখা ভাল যে, প্রহসন দুখানি ও কৃষ্ণকুমারী পাইকপাড়ায় অভিনীত হয় নাই ; হয়েছিল কলকাতায়, তবে অন্য রঙ্গমঞ্চে।

তখনও সাধারণ রঙ্গমঞ্চ—যেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার—তা হয় নাই। পাইকপাড়ার মত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে, পাথুরিয়াঘাটায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রাজ-বাড়িতে, শোভাবাজার রাজবাড়িতে এই নতুন ধরণের নাটক—যা যাত্রা নয়, "থিয়েটার"—অভিনয় হত। রামনারায়ণ পণ্ডিত মহাশয় আর মধুসূদন দত্ত মহাশয় ভিন্ন আরও অনেকে নাটক লেখা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের বহু নাটক তাদের বিদ্রূপ ও সরসতার গুণে আসর জমিয়ে রেখেছিল। রাজরাজড়াদের বাড়িতে যাদের যাওয়া-আসা পোষাত না, যাদের ধনাঢ্যদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ পাওয়া সম্ভব হত না, অথচ যারা এই অভিনব অভিনয় দর্শন করতে চাইত, তারা সখের থিয়েটারের দল গঠন করতে লাগল। কলকাতায় বৌবাজারে এক নাট্যশালা গড়ার ব্যবস্থা হল, সেখানে কবি মনোমোহন বসুর রামাভিষেক, সতী ইত্যাদি নাটকের অভিনয় দেখান হল। এসব নাটক কলকাতাতেই আবদ্ধ থাকে নাই, বিভিন্ন জেলায় গিয়ে পৌঁছল এদের ঢেউ। যাত্রার দলও এই ধরণের অভিনয় আরম্ভ করে দিল, জেলায় জেলায় আলোকপ্রাপ্ত বা আলোকপিয়াসী 'শহুরে'-ভাবাপন্ন লোকেরাও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। বাগবাজারে এক

দল গড়ে উঠল, এই দলই কালে বড় হয়ে বাংলায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করল, এই দলেরই মধ্য থেকে বের হলেন গিরিশ ঘোষ। দীর্ঘজীবন নাট্যসাহিত্যের ও রঙ্গমঞ্চের সেবা করে তিনি বাঙ্গালীকে প্রায় আশি খানি নাটক দিয়ে গিয়েছেন, এই সব নাটক থেকে আমাদের শিখবার আছে বিস্তর। গিরিশবাবু নিজে অভিনয় করতেন, অভিনয় শিক্ষা দিতেন, দল গঠন করতেন—সুতরাং তাঁর বহু দিক দিয়ে পারদর্শিতা ছিল। তাঁর সহকর্মী, শিষ্য, অনেকেই বঙ্গরঙ্গমঞ্চে কৃতকর্মা হয়েছিলেন; একজনের নাম করি—অমৃতলাল বসু, যাঁর সরসতার জন্য তাঁর পরলোকগমনের পর আজও সকলে তাঁকে জানে তাঁর বিবাহ-বিভ্রাট ও খাসদখল 'রসরাজ' বলে।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দুইজন নাট্যকারের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কথা পরে বলব; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথের সেজদা—সেকালের নাট্যকারদের মধ্যে একজন নামকরা লোক ছিলেন। তবে গিরিশবাবুর নাটক যখন একে একে বের হতে আরম্ভ করল, তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখনী মৌলিক রচনা থেকে সরে গিয়ে নাট্যানুবাদে প্রবৃত্ত হল; নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি এদিক দিয়ে খুবই কাজ করে গেছেন।

বিংশ শতকের প্রথম বিশ বৎসরে বাংলা নাটকের কথা উঠলে দুজনের নাম করতেই হয়—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য ও অন্যান্য নাটক, বিশেষ করে ঐতিহাসিক নাটক, এক সময়ে বাংলার

বিভিন্ন শহরে অভিনয় হোত ; তাঁর নাটকগুলির জমাট একটা ভাব ছিল। আর দ্বিজেন্দ্রলাল মোগল ইতিহাসকে নাটকের সাহায্যে খুব উজ্জ্বল করে ধরেছিলেন, তাঁর পাত্রপাত্রীর কথার ভাষাতেও একটা নিজস্ব ভঙ্গী ছিল, তাঁর দীর্ঘ 'কোরস' গানগুলি গিরিশ ঘোষের 'সমবেত সঙ্গীত' অপেক্ষা ছিল বেশ একটু পৃথক ধরণের। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকে বাংলা নাটককে দ্বিজেন্দ্রলালের নামেই বেশি চেনে।

বাংলা রঙ্গমঞ্চে শিশির ভাদুড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরীর মত শক্তিমান নট এখনও আছেন ; অভিজ্ঞ নাট্যকারও আছেন ; আবার সেই আগেকার দিনের মত দৃশ্যপট বাদ দিয়ে নৃত্য ও গানের প্রাচুর্যে অভিনয় জমিয়ে তোলা সম্ভব কি না, তার পরীক্ষাও হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু আজ চলচ্চিত্রের বন্যা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উজ্জ্বল আভা হরণ করে নিয়েছে। সে পঞ্চাংক নাটক শুনবার ধৈর্য কই এখন লোকের! চলচ্চিত্রের সময় দুই আড়াই ঘণ্টা, আর এতে যে পাঁচ ঘণ্টা, প্রায় দ্বিগুণ সময় লাগে। তারপর চলচ্চিত্রে শুধু বাংলার নয়, বিশ্বের শিল্পীরা তাঁদের চাতুর্য দেখাতে আসেন, তারও আকর্ষণ কম নয়। 'নব রে নব, নিতুই নব'—মানুষ চায়, নিত্য নবতমের সাক্ষাৎ পরিচয় পেতে, কারণ যতই বয়স হোক মানুষের সচল প্রাণে শিশুসুলভ একটা কৌতূহল আছে। এই সব কারণে বাংলার রঙ্গমঞ্চ তার স্বাভাবিক পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে পারছে না—বহুদেশের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রঙ্গমঞ্চপরিচালক ও ভাবনিষ্ঠ

নাট্যকার থাকা সত্ত্বেও—আজকার দিনে অর্থাগম কোথায় অধিক ও নিশ্চিত, সেই ভাবনায় সমাজের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় তাঁদেরও যে টনক নড়েছে।

পঠনীয় :

Dr. S. K. De—History of Bengali Literature in the 19th century (1800-25)

Dr. P. Guha-Thakurta—Bengali Drama

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

৬

এতক্ষণ কবি ঈশ্বর গুপ্তের কথা পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি সম্বন্ধে বলা হল। ঈশ্বর গুপ্তের পরে হঠাৎ দেখা গেল, আধুনিক বাংলা অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। ভারতচন্দ্রের সময় থেকে ঈশ্বর গুপ্তের সময় পর্যন্ত উন্নতির যে ধারা দেখা গিয়েছিল, তা যেন হঠাৎ কেমন একটা জোর পেয়ে প্রবল আকার ধারণ করল। নাটকের কথার মধ্য দিয়ে সে পরিবর্তনের একটা পরিচয় সামান্যভাবে দেওয়া হয়েছে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি এসে দেখা যায়, বাংলা সাহিত্য ভারত সাহিত্যে অগ্রগণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পঞ্চজন সাহিত্যরথী যেন পাঞ্চজন্য শংখ বাজিয়ে ভারতী-ভাগীরথীকে বঙ্গদেশের মধ্য দিয়ে নতুন খাতে বইয়ে নিয়ে চললেন।

এই পাঁচজনের মধ্যে প্রথমে রঙ্গলালের নাম করি। আজ হয়তো তাঁর নাম শুধু ইতিহাসের পাতায় আবদ্ধ, কিন্তু মাত্র একশ বৎসর পূর্বের কথা স্মরণ করি, তিনি ছিলেন তখন নব বঙ্গসাহিত্যের প্রথম প্রশস্তিকার। ইংরেজি পড়ুয়া হয়েও তিনি গম্ভীরভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এবং প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে বাংলা সাহিত্যে ভাল কাব্য রচনা করা যেতে পারে। আজকার দিনে সে প্রমাণের কোনও প্রয়োজনই

নেই ; বরং যদি কেউ একথা জোর গলায় বলে, তাহলে তার মস্তিষ্কের সুস্থ অবস্থা বিষয়ে বেশ একটু সন্দেহ হয়। কারণ রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিশ্বের যে কোনও কবি-দরবারে হীনপ্রভ হবে না, এ জ্ঞান আমাদের হয়েছে, এবং যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ কাব্য লিখলেন, বেশি নয়, রবীন্দ্রনাথের লেখার মাত্র ত্রিশ বত্রিশ বৎসর পূর্বে কৃতবিদ্য লোককে প্রবন্ধ লিখে বক্তৃতা করে শিক্ষিত লোকদের বলে কয়ে বোঝাতে হয়েছিল যে সেই 'বাংলা ভাষাটা নেহাৎ বাজে নয়, তাতে সৎকাব্য রচনা করাও যায়'—এর চেয়ে অদৃষ্টের পরিহাস আর কি হতে পারে! হায় রে কপাল! লাভের মধ্যে এই যে, অদৃষ্ট বঙ্গসাহিত্যের প্রতি সুপ্রসন্ন, বিরূপ নয়, এবং পরিহাসটা আমাদের গায়ে আজ আর লাগছে না। আমরাই এখন তাদের বিদ্রূপ করি, যারা এবিষয়ে অন্যমত পোষণ করত বা বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একদিন সন্দিহান হয়েছিল।

রঙ্গলাল তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, বঙ্গসাহিত্যের এই প্রশস্তি লিখে নয়, প্রশস্তির প্রমাণের জন্য কাব্য রচনা করে। পদ্মিনীর উপাখ্যানে রাজপুতানার—শুধু রাজপুতানার কেন বলি, সারা ভারতবর্ষের —বীরপ্রাণের তারে ঘা পড়েছিল। কবি আলাওয়ালও পদ্মাবতী রচনা করেছিলেন এই উপাখ্যান নিয়েই, সে কথা বলেছি ; তার মধ্যে কত কাব্য, কত রূপক, জীবাত্মা-পরমাত্মার কত কথা, কত পাণ্ডিত্য, কত সূক্ষ্ম তত্ত্ব ছিল। রঙ্গলাল পদ্মিনীর

উপাখ্যান রচনা করলেন, তাতে পাণ্ডিত্য নাই, সুক্ষ্ম তত্ত্ব নাই —রূপক নাই—ঐতিহাসিক গাথা নিয়ে কাব্য, ছেলেবেলায় বড়দের মুখে শোনা তার দুই একটি চরণ এখনও মনে আছে, এখনও কানে বাজছে—

শ্রাবণের বারিধারা প্রায়,
পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়।

কিশোর বীর বাদলের সেই বীরত্বের কথা তখনকার পাঠকদের প্রাণে অপূর্ব উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল। শিক্ষিত অর্থাৎ ইংরেজি-শিক্ষিত পাঠকেরা তখন বাংলা সাহিত্য যদি বা কখনও পড়তেন, তবে তা স্কট বায়রণ ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজের, অর্থাৎ রোমান্টিকধর্মী ইংরেজি কবিতার, চশমা দিয়ে; তাঁরা রঙ্গলালের পদ্মিনীর উপাখ্যানে, শূরসুন্দরীতে, কর্মদেবীতে যেন স্কটের কাব্যের একটা আমেজ পেলেন; ইউরোপের মধ্যযুগের কথা, আর আমাদের দেশে মোগল-রাজপুত সংঘর্ষের যে যুগ তার কথা, উভয়েরই একটা দূরাগত আকর্ষণ আছে। সে সমস্ত দিন আর নাই; তখনকার অস্ত্রশস্ত্র বর্মচর্ম, তখনকার দুর্গপ্রাকারপরিখা ও আত্মরক্ষার অন্য উপায়, এখনকার লোককে বুঝাতে হলে টীকা-টিপ্পনীর দরকার হয়ে পড়ে। তাই স্কট ও রঙ্গলাল, ইংলণ্ডে ও বঙ্গদেশে, সাধারণের অজ্ঞাত কিছু কিছু শব্দের প্রয়োগ ও পাদটীকায় তাদের অর্থ স্ফুট করেছেন। নবপরিবেশে পাঠকদের চিত্ত মুগ্ধ হোল; এই তো রোমান্টিকধর্মী সাহিত্যের লক্ষণ, strangeness added to

beauty, অজানার সৌন্দর্য। অপরিচয়ে সৌন্দর্য যে আরও বাড়ে। রঙ্গলালের ভাষা খুব মোলায়েম ছিল না, বড় বেশি সংস্কৃত-ঘেঁষা ছিল, কিন্তু কথাবস্তু ও বর্ণনাভঙ্গীর অভিনবত্ব সে সমস্ত ছাপিয়ে পাঠকদের মন হরণ করল।

এর দুচার বৎসরের মধ্যেই বাঙ্গালী পাঠকের সমাজে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। এবার যেন ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলায় বই বেরতে শুরু করল। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ—একের পর একে পাঠকদের চকিত, ব্যস্ত, মুগ্ধ করে তুলল। বেলা অপরাহ্ন, নির্জন প্রান্তর, প্রান্তরের মধ্যে এক শিবমন্দির, হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি, এ ঘোর দুর্যোগের মধ্যে একক অশ্বারোহী রাজপুত যুবা ধীরে ধীরে এসে সেই মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করলেন, ও দেখলেন যে দুইজন সুন্দরী রমণী তাঁর পূর্বেই সেই মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন! এই যে ছবি, এ তো ভুলবার নয়, এ যে ভোলাবার। বঙ্কিমচন্দ্রের রেখাচিত্রের এই ইংগিত তাঁর অনুকরণকারীরা সযত্নে গ্রহণ করছেন, কিন্তু বহুবার নকল করলেও আসলের লাঘব হয় না—দুর্গেশনন্দিনীর আরম্ভ অনবদ্যই হয়ে রইল, তার ভঙ্গীটি চিরকালের জন্য এক অপূর্ব রোমান্টিক motif বা প্রযোজক রূপে গণ্য হল।

তেমনি ধারা কপালকুণ্ডলা। সাগর-সৈকতে সঙ্গী-পরিত্যক্ত পরহিতৈষী নবকুমার পথের সন্ধানে উদ্‌ভ্রান্ত, কোথাও কেউ নাই, হঠাৎ চোখের সামনে পড়ে গেল অপূর্ব

নারীমূর্তি, আর কানে পৌঁছল সেই নারীমূর্তির সমবেদনা-ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?" শেকসপীয়র পড়ে যাদের সাহিত্যবোধ জাগ্রত হয়েছে, তারা নিজেদের মাতৃভাষায় এখন যা শুনতে পেল, তা ইংরেজ নাট্যকারের অনুরূপ ধ্বনি, কিন্তু প্রতিধ্বনি নয়।

রচনাকৌশলে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকদের মন একেবারে কেড়ে নিলেন। তিনি যে কত বড় কবি ছিলেন, তা তাঁর অপরিণত বয়সের লেখা ললিতা ও মানস দেখলে বোঝা যায় না; বরং তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে যে ছড়া ও গান ছড়িয়ে আছে, তা থেকে তবু খানিকটা অনুমান করা যায়; আর তাঁর ভাষার বৈচিত্র্য ও আবেগ থেকেও খানিকটা সন্ধান মেলে। মানুষের মনের যে বিচিত্র রাগিণী নানা তালে বেজে ওঠে, তার ভাষা খুব কম লেখকেরই হাতে ধরা দেয়। বঙ্কিমের সে কৌশল জানা ছিল, আর ভাল করে গল্প বলতেও তিনি পারতেন। স্যর ওয়ালটার স্কটের উপন্যাসগুলি মাসিক সংখ্যায় যখন প্রথম প্রথম বের হত, তখন তাঁর পাঠকেরা কী একান্ত আগ্রহের সঙ্গেই না সেই মাসিক খণ্ডগুলির অপেক্ষায় বসে থাকতেন! তেমনি ধারা ঐকান্তিক আগ্রহের সঙ্গে এদেশে বঙ্কিমের পাঠকেরা অপেক্ষা করতেন, কখন বঙ্গদর্শনের নতুন সংখ্যা বঙ্কিমের গল্পের আর এক কিস্তি বহন করে নিয়ে আসবে! যারা সেদিন বঙ্কিমকে বাংলার স্কট বলে অভিনন্দন করেছিল, তাদের মনের কোণে কিন্তু সেদিন কোনও সংকোচ ছিল না,

ও অভিনন্দন পুরোপুরি অভিনন্দনই—আজই না হয় ও-টা আমাদের কানে গালাগালির মত লাগে। বঙ্কিম একই ছবি বারবার না দেখিয়ে বিচিত্র প্রকারের উপন্যাসের দ্বারা সমস্ত পাঠকসমাজের চিত্ত একেবারে হরণ করে নিলেন। তাই তাঁর প্রভাবকে যুগান্তকারী প্রভাব বলা চলে। 'টেকচাঁদ' বা প্যারীচাঁদ মিত্র আলালের ঘরের দুলাল লিখে হয়তো কথাসাহিত্যের সূত্রপাত করে গিয়ে থাকবেন, কিন্তু উপন্যাস সাহিত্যের বঙ্কিমই ছিলেন একচ্ছত্র সম্রাট। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব বর্ণনা করতে গিয়ে সংস্কৃত কাব্য থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন—সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনির্। তাঁর ব্যক্তিত্ব ঘিরে একটি মহিমার ভাব বিরাজ করত, রাজাগমনের মতই সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবে দেশের মধ্যে একটা সোরগোল পড়ে গিয়েছিল!

তার অবশ্য অন্য কারণও ছিল। বঙ্কিমবাবুর প্রভাব শুধু উপন্যাস লেখার মধ্য দিয়ে নয়, অন্যভাবেও আত্মপ্রকাশ করেছিল। বঙ্গদর্শন তাঁর নামেই বের হক, আর তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র কর্তৃক সম্পাদিত বলেই প্রকাশিত হক, সকলেই জানত যে চিন্তা, নির্দেশ, লেখা—তার সবই বঙ্কিমবাবুর ভাবে অনুপ্রাণিত। এখনকার চেয়ে তখনকার দিনে অমনি একখানা মাসিক পত্রের শাসন অনেক কঠোর, তার কথা অনেক স্পষ্ট ছিল; লোকে তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস করত না। বঙ্গদর্শন কাগজখানাও শুধু সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য বা

হালকা ভাবের ছিল না; বঙ্গদর্শনের গাম্ভীর্য তার ভাবে ভাষায় পরিকল্পনায় অনুষ্ঠানপত্রে সর্বত্র ও সর্বথা প্রকাশ পেত। নব্য লেখকদের প্রতি, কি নবসংস্কৃতি বিষয়ে, বঙ্গদর্শন যা বলে গেছে, আজও সে উপদেশ আমাদের আনত মস্তকে গ্রাহ্য।

বঙ্কিমবাবু শুধু সাহিত্য সৃষ্টি করেই খুশি থাকেন নি, জনসাধারণের শিক্ষার জন্যও তাঁকে কলম ধরতে হয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন যে বঙ্গদর্শন হবে এই শিক্ষার বাহন, শিক্ষিত বাঙ্গালী এর মধ্যে যে সব তত্ত্ব ও তথ্য পাবেন তা সাধারণে প্রচার করতে পারবেন। তাঁর বিবিধ প্রবন্ধ জীবনের বহু ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিল; বাংলার ইতিহাস, বাংলার সাহিত্য, সমস্যা, চাষীদের অবস্থা, সাহিত্য-বিচার তাঁর দৃষ্টিসীমার মধ্যে সবই পড়েছিল। আজকার বিশ্লেষণপটু বিচারদৃষ্টি তাঁর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত কোনটিই উপেক্ষা করতে পারে না। পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের প্রতি, এমন কি সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখা সমাজ-বিজ্ঞানের প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা ছিল যথেষ্ট, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন হিন্দুর অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে জগতে প্রচার করতে, যাতে বিশ্বের সঙ্গে হিন্দুর আদান-প্রদানের একটা সম্বন্ধ দাঁড়িয়ে যায়। তাই ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায়, শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে তাঁর ছিল এত যত্ন। শ্রীকৃষ্ণই তাঁর মতে সকল বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন হেতু পাশ্চাত্যের মাপকাঠিতেও শ্রেষ্ঠ পুরুষ, সুতরাং ভাগবত পুরুষ।

সাহিত্যের রূপের দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে আরও কিছু বলার আছে। তিনি নতুন এক রূপ সৃষ্টি করেন, কমলাকান্তের দপ্তরের রূপ, হাস্যরসের পটভূমিকায় চরিত্র সৃষ্টি করে তাকে দিয়ে গম্ভীর চটুল নানারূপ প্রসঙ্গের যথাযথ অবতারণা করান। প্রসিদ্ধ ইংরেজ সাহিত্যিক ডি কুইন্সির মত, আফিংখোর কমলাকান্তের দিব্য দৃষ্টি খুলে গিয়েছিল; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, দুই বিরোধী ভাবের সংঘাতের ফলে ভারতবর্ষে বা বাংলাদেশে যে ভাবদ্বন্দ্ব উপস্থিত, তার সম্বন্ধে নিজের মতামত কমলাকান্তের মারফৎ স্পষ্ট করে খুলে বলতে বঙ্কিমচন্দ্র কোন সংকোচ করেন নাই। তাঁর শ্লেষগর্ভ সে মতামত আজকার দিনেও পুরানো হয়ে যায় নাই। আর সে মতামত প্রকাশ করবার অপরূপ ভঙ্গী তখনকার দিনে এবং তারও কিছুকাল পরে অনেককেই মুগ্ধ করেছিল, এবং কেউ কেউ তার অনুকরণেও প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু কথায় যে বলে, 'যার কর্ম তারে সাজে'; গ্রীকদেশে অনুরূপ প্রবাদ রয়েছে যে,—'ইউলিসিসের ধনু চালান যার তার কর্ম নয়, ও শুধু ইউলিসিসকেই মানায়'।

গদ্যে, কথাসাহিত্যে, প্রবন্ধে, সাময়িক পত্রে, ধর্মবিচারে বঙ্কিমচন্দ্র যা কিছু রেখে গেলেন, প্রায় উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত তার জয়জয়কার তো স্বীকার করতেই হবে। ভূদেব বাবুর সমাজবিষয়ক দৃষ্টি বঙ্কিমের চেয়ে গভীরতর, ও দূর-প্রসারিণী, কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে বঙ্কিমের মত পাঠকের

মনকাড়ান সে ভাব নাই। তের বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে (বঙ্কিমের জন্ম হয় ১৮৩৮ সালে) বঙ্কিম শতবার্ষিকী উৎসব হয়; তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের পুরোপুরি সমালোচনা হতে পেরেছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বঙ্কিমেরই সাহিত্যজীবনের আরম্ভে অল্প কয় বৎসরের চেষ্টায় মধুসূদন যে নব্য কাব্যস্রোত বাংলা ভাষায় এনে দিলেন, তার পরিমাপের চেষ্টার সূত্রপাত এখনও হয় নাই। এক হিসাবে মধুসূদন বঙ্কিমের সহযোগী, উভয়ে যেন উভয়ে সম্পূর্ণ, একজন কথাসাহিত্য ও গদ্যসাহিত্য, অন্যজন কাব্যসাহিত্য ও নাট্যসাহিত্য রচনা করেছেন—এই-ভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। মধুসূদনের নাট্যরচনা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা হয়েছে; সে নাট্যরচনা অদ্ভুত; কাব্যরচনাও তেমনি বিস্ময়কর। ঝড়ের মত যেন তিনি বঙ্গসাহিত্যের আসরে এসে পড়লেন; কিন্তু ঝড় তো ভাঙ্গে, ওলট পালট করে, সৃষ্টি করে কই? মধুসূদন একটানে অতীতের সাহিত্য-সংস্কারকে ফেলে দিয়ে নতুন সৃষ্টিকে তার জায়গায় এনে বসালেন। সরস্বতীর সত্যকার বরপুত্র তিনি ছিলেন, যা গড়তে চাইলেন তাই গড়ে গেলেন, অথচ কত অল্পকালের মধ্যে সব হল। অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাংলায় কবিতা রচনা হতে পারে না—ফরাসি ভাষা জগতের সেরা ভাষা, বিদগ্ধজনের ভাষা, সেই ভাষাতেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনার চেষ্টা সার্থক হয় নাই—এই একটা তর্কের ক্রমে তিনি জিদ ধরে বসলেন, বললেন, নিশ্চয়ই অমিত্রাক্ষর ছন্দে

বাংলায় ভাল কবিতা রচনা করা যায়, আর তিনি তা রচনা করে দেখাতেও পারবেন। তাঁর কথা যে সত্য, তা প্রমাণ করবার জন্য তিনি উঠে পড়ে তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য লিখতে শুরু করলেন, এবং অল্পদিনের মধ্যে লিখেও ফেললেন। তার পর নতুন ধরণে মহাকাব্য লিখতে আরম্ভ করলেন, পুরানো স্টাইলের মহাকাব্য নয়—ইউরোপীয় এপিকের ধরণের একটুকরা কাব্য, এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দেই। সে কাব্য মেঘনাদবধ; রাম আর রাবণের সম্বন্ধে সনাতন শাস্ত্রানুমোদিত নীতি অগ্রাহ্য করে মেঘনাদকে লঙ্কার সুসন্তান করে চিত্রিত করলেন, কিন্তু রাম বা রামানুজকে আর তেমন উজ্জ্বলবর্ণে আঁকলেন না। বিদেশী সাহিত্যে যাঁরা পণ্ডিত, তাঁরা বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে এখানে ওখানে মিল দেখে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন; আর যাঁরা সংস্কৃত কাব্যে পণ্ডিত, কবির ত্রুটিবিচ্যুতি ও নবীন কাব্যে বিশ্বাস স্বত্বেও, কাব্যের চমৎকারিতায় মুগ্ধ হয়ে এগিয়ে এসে নব্য কবিকে অভিনন্দিত করলেন। লোকে জানত, মাইকেল মধুসূদন সাহেব মানুষ, বিদেশী নানা ভাষায় বিদেশী নানা সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, ইংরেজিতে কাব্য পর্যন্ত রচনা করে ফেলেছিলেন; তারপর বেথুন সাহেবের কথায় না হয় বাংলা লিখতে শিখেছেন, কিন্তু শব্দ যোজনায় এ হেন সহজপটুতা, সংস্কৃত শব্দচয়নে ঝঙ্কারসৃষ্টির এ নিপুণ ক্ষমতা, কি করে তাঁর হল? মেঘনাদবধ কাব্যের ধ্বনিতরঙ্গ গম্ভীর, সুন্দর, অথচ শুনলে মনে হয়,

অযত্নসিদ্ধ; পরবর্তী কালে লোকে অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ব্যঙ্গ করেছে, তাঁর সমসাময়িকেরা তো করেছেনই, কিন্তু ঐ ধ্বনি-তরঙ্গ অনুসরণ, কি অনুকরণ, কি বিদ্রূপ, বেশিক্ষণ ধ'রে কিছু ক'রারই শক্তি কারও হয় নাই। মেঘনাদবধের পরে তাঁর অপূর্ব কাব্য ব্রজাঙ্গনা—অপূর্ব তার ভাষা, অপূর্ব তার ভাব, খাঁটি বৈষ্ণবেরাও সে কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে দূর থেকে মধুসূদনের বাড়িতে এ'সে তাঁকে তাঁর এই বৈষ্ণবরস পরিবেশন জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গিয়েছিলেন। মধুসূদনের পত্রকাব্য বীরাঙ্গনা—তাও যে রূপে রসে ভাবে বাংলাসাহিত্যে একেবারে অভিনব বস্তু। যে বিস্ময়ের ভাব সেদিন মনে উদয় হ'য়েছিল, এতদিনেও আমরা তাকে মন থেকে দূর করতে পারি নাই। জনা প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র নূতন আলোকে বাঙ্গালী পাঠকের মানস চক্ষুর সামনে ভেসে উঠল। তার উপর আবার চতুর্দশপদী কবিতাবলী! একাধিক সাহিত্যে পরীক্ষার ফলে বোঝা যায় যে দেখতে সোজা হ'লেও সনেট লেখা কঠিন, ভাল সনেটের সংখ্যা যে কোনও সাহিত্যেই পরিমিত, কিন্তু সেই স'নেট বা চতুর্দশপদী বাংলায় মধুসূদনেরই কীর্তি। কাব্য হতে কাব্যান্তরে, রূপ হতে রূপান্তরে মধুসূদন বিচরণ করেছেন, অল্পসময়ের মধ্যে, অবলীলাক্রমে, আর ভেবেছেন শুধু ভাবী সুদিনের কথা, যখন বাস্তবিক তিনি বঙ্গভারতীকে বিধিমত পূজা করতে পারবেন, এমন মধুচক্র রচনা করবেন যা

থেকে নিরবধি গৌড়জন সুধা পান করবে। আরও বিস্ময়ের কথা এই যে, যা লিখে গেছেন তা সব কিছু যে মক্স করা, হাত পাকান মাত্র; পাকা হাতের খেলা তো পরে দেখাবার কথা। দুর্ভাগ্য আমাদের, সে সুদিন আর এল না, মধুসূদনের পাকা হাতের খেলা আমরা আর দেখতে পেলাম না। যতই দিন যায়, ততই আমরা তাঁর ক্ষমতার বিপুলত্ব অনুভব করি, আর তাঁর পরিণত হাতের রচনা পেলে বাংলাভাষা ও সাহিত্য যে কত খানি এগিয়ে যেত, তাই নিয়ে করতে থাকি জল্পনা ও কল্পনা। মাইকেল মধুসূদনের কথা বলতে গেলে একদিক যেমন গৌরববোধ, অন্যদিক তেমনি ব্যথা অনুভব—দুই-ই হয়।

মধুসূদন পরলোকে যান ১৮৭৩ সালে; তাঁর সময় থেকে ঊনিশ শতকের বাকি কয়টা বৎসর বাংলা কবিতার আসর যাঁরা জমিয়ে রেখেছিলেন, হেমচন্দ্র তাঁদের একজন। প্রথমেই নাম করি তাঁর বৃত্রসংহারের। মেঘনাদবধের আয়তন স্বল্প, মাত্র কয়টি সর্গ—গুণে দেখতে পাই নয়টি; আর বৃত্রসংহারের সর্গসংখ্যা চব্বিশ। বৃত্রসংহার আগাগোড়া সবটা অমিত্রাক্ষর ছন্দে নয়—কিছু অমিত্র, সর্গে সর্গে ছন্দ পরিবর্তনের ব্যাপারে কবি সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের বিধান অনুসরণ করে মিশ্র রীতিতেই রচনা করে এসেছেন। ইংরেজি-শিক্ষিত পাঠকেরা মিল্‌টনের প্যারাডাইস লস্টের সঙ্গে হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারের সাদৃশ্য দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হলেন। আবার প্রাচীনপন্থী

পাঠকও হেমচন্দ্রের কাব্যে মধুসূদনের সব নতুন করে গড়ার ক্ষমতার তেমন পরিচয় না পেয়ে কতকটা নিশ্চিন্তমনে কাব্যরস আস্বাদ করতে লেগে গেলেন। শেকসপীয়রের দুইখানি নাটক তিনি অনুবাদ করেছিলেন, রোমিও-জুলিয়েট ও নলিনী-বসন্ত বা টেম্‌পেস্ট। কিন্তু নাটকে তাঁর রচনা বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্থান পায় না। বরং তাঁর ছায়াময়ী কাব্য, তাঁর বীরবাহুর ঘটনা, তার মধ্যে বলবার মত কিছু আছে: দশমহাবিদ্যায় তত্ত্বদৃষ্টির পরিচয় আছে, তার ছন্দও খানিকটা নতুন সৃষ্টি করার আনন্দে উজ্জ্বল; তবে আসলে তো হেমচন্দ্র আজও বেঁচে আছেন তাঁর খণ্ড কবিতার জন্য—ছোট ছোট কবিতার জন্য।

বলো না কাতরস্বরে, বৃথা জন্ম এ সংসারে,
এ জীবন নিশার স্বপন।
দারা পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার
বলে জীব করো না ক্রন্দন॥

এযে ইংরেজিরই অনুবাদ, মৌলিক রচনা নয়, প্রথম পড়ে তা মনে করা কঠিন। অনুবাদে তিনি এমনি পটু ছিলেন। তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা, দেশলাই-বন্দনা, ধরায় পুষ্পকরথের উদ্দেশে প্রণতি, নানা উপলক্ষ্যে কৌতুক উক্তি—বাঙ্গালী উপভোগ করেছিল; 'পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে'—বাঙ্গালীকে অভিভূত করেছিল; অন্ধ কবির বিলাপ ও পরমেশ্বরের কাছে আবেদন—'বিভু, কি দশা হবে আমার'—বাঙ্গালীর হৃদয়ে

সমবেদনার প্রবাহ জাগিয়ে তুলেছিল। 'বারেক এখনো কি রে দেখিবি না চাহিয়া'—বাঙ্গালীকে সেদিন মাতিয়ে তুলেছিল। এমন কি, যে কবিতা এখন আর লোকে তেমন পড়ে না, সেদিন তারও মূল্য ছিল যথেষ্ট—'আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!' আজ এ কবিতা পড়তে হয়তো গেলে হাস্য সংবরণ করা কঠিন, কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন এ কবিতা পড়তে গিয়ে উদ্গত নয়নাশ্রু রোধ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াত। বয়সের ধর্ম? তা হতে পারে; তবে শুধু পাঠকপাঠিকার নয়, সাহিত্যেরও বটে।

নবীন বাবুর সাহিত্য-সম্পদের কথা এককালে লোককে বুঝিয়ে বলতে হত না। তাঁর পলাশির যুদ্ধ ঘরে ঘরে পড়া হত; মন্ত্রণাসভায় জগৎ শেঠের সেই আত্মনিন্দা লোকের ভাল লাগত—'প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহসে দুর্জয়, কার্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ'; তাঁর পরামর্শ ছিল, সিরাজকে সিংহাসন হতে নামিয়ে সোজাসুজি মীর জাফরকে সেখানে বসান; রানী ভবানীর তেজস্বিতা ও দূরদর্শিতা তখনকার পাঠককে মুগ্ধ করেছিল; তেমনি ভাল লেগেছিল মোহনলালের গর্জন—ও তারপর বিলাপ—

চাহি না স্বর্গের সুখ, নন্দন কানন,
যদি পাই,—কিন্তু হায়! ফুরাল স্বপন!

চিন্তাশীল বহু পাঠকের কাছে তাঁর রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও

প্রভাস—এই কৃষ্ণকাব্যত্রয়ী বেশি ভাল লেগেছে, পরলোকগত হীরেন দত্ত মহাশয় বিশেষ করে এই তিনটি কাব্যের জন্য নবীন বাবুর প্রশংসা করে গেছেন। এদের পটভূমিকা হল সমগ্র আর্য সভ্যতা; আর্য-অনার্য সংঘর্ষ। কৃষ্ণ স্বয়ং ব্রাহ্মণ-বিরোধী, আর দুর্বাসা কৃষ্ণার্জুনবিরোধী। দুর্বাসার অভিশাপ শুনে কৃষ্ণ হেসে বলছেন—

নরের অদৃষ্ট
ব্রাহ্মণের শাপাধীন হইত যদ্যপি,
আজি এ ভারতবর্ষ হইত শ্মশান।

কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই পরিকল্পনার যে অভিনবত্ব, তার কৃতিত্ব নবীনচন্দ্রের। ভদ্রাকেও তিনি নতুন ভাবে এঁকেছেন। ভদ্রার পরিচয় কৃষ্ণ দিচ্ছেন অর্জুনকে—

আমার ভগিনী,
সারণের সহোদরা, প্রাণের অধিক
আমি ভালবাসি তারে। স্নেহে ভরা মুখ
তার, স্নেহে ভরা বুক; স্নেহসুধারাশি
ভদ্রার ঈষৎ হাস্যে পড়ে ছড়াইয়া।
পরিবারে পরিচিতে সর্বত্র সমান,
পালিত বনের পশু-বিহঙ্গ-নিচয়ে;
উদ্যান কুসুমে সদা সেই স্নেহামৃত
বরষে আমার ভদ্রা অজস্রধারায়।

যেইখানে রোগী, শোকী, ভদ্রা সেইখানে,
মূর্তিমতী শান্তিরূপা। অশ্রু যেইখানে,
সেখানে ভদ্রার কর। যেখানে শুকায়
পুষ্পবৃক্ষ পুষ্পলতা, আছে সেইখানে
সলিলরূপিণী ভদ্রা। ডাকিছে যেখানে
অনাহারে পশু,পক্ষী, দরিদ্র, ভিক্ষুক,
সেইখানে অন্নপূর্ণা সুভদ্রা আমার।

এই সুভদ্রার মধ্যে মিশেছে অপূর্ব প্রেম, অপূর্ব শান্তি, আর কবিতার মধ্যে কবি ঢেলে দিয়েছেন এ যুগের সেবাব্রতধারিণী রেডক্রসচিহ্নিতা ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের ভাবধারা! অর্জুনের জন্য শৈলজার লোকাতীত প্রেম, কৃষ্ণের জন্য জরৎকারুর অতৃপ্ত প্রেম আর আত্মবিসর্জন—সকল চিত্র মিলে এই কাব্যকে একটা স্নিগ্ধরূপ দিয়েছে। নবীনবাবুর কবিত্বশক্তি রঙ্গমতীতে বীরেন্দ্রের চিত্রে ও অবকাশরঞ্জিনীর খণ্ড খণ্ড কবিতায় খানিকটা দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু কৃষ্ণকাব্যের ভিতরে তিনি যেন প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন।

দিও জ্ঞান, ভক্তি, বল! দিও শিক্ষা আত্ম-দান!
দিও পদাম্বুজ-ছায়া! ধর্ম রাজ্যে দিও স্থান!
শুনিতে শুনিতে যেন পুত্রমুখে কৃষ্ণনাম,
নবীনের হয় এই অপরাহ্ন অবসান!

—কথাগুলির মধ্যে আন্তরিক প্রার্থনার সুর ফুটে উঠেছে। এই ধরণের কবিত্বশক্তি থাকা সত্ত্বেও বর্তমান যুগের

সমালোচকেরা কেউ কেউ নবীন বাবুকে আর কবি বলে গ্রহণ করতে রাজি নন। কারণ বুঝে ওঠা কঠিন; তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে তাঁর সময়ে তাঁর গুণগ্রাহী পাঠকের অভাব হয় নাই। বাঙ্গালীর নব প্রতিভার অন্যতম স্ফুলিঙ্গ তিনি, এবং রঙ্গলাল-বঙ্কিমের সঙ্গে মধু-হেম-নবীন কবিত্রিতয়ের নাম সাহিত্যের ধারায় চলে এসেছে।

আকবরের রাজসভায় একবার নাকি বাদসাহ মাটিতে একটা খড়ির দাগ টেনে নিয়ে বলেছিলেন তাঁর সভাসদদের—এইটে না মুছে এটাকে ছোট কর। বীরবল এগিয়ে গিয়ে তার পাশে একটি দাগ টান্‌লেন, সেটি বেশি লম্বা। শুনতে পাই, আমাদের দেশে কোন কোন সমাজে বিয়ের সময় বরের বুদ্ধিপরীক্ষাও এই ভাবে হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে ও তাঁর দেশ-দেশান্তরে প্রসারিত খ্যাতির জন্য পূর্বতন কবিদের কথা লোকে খানিকটা ভুলে যাবে, এটা অস্বাভাবিক নয়। তা ছাড়া আমরা ইচ্ছায় হক আর অনিচ্ছায় হক, বলেই থাকি—'জয়, বর্তমানের জয়'। সে কথা মনে রাখা দরকার।

পঠনীয়: অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্র
যোগীন্দ্রনাথ বসু—মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত
শশাঙ্কমোহন সেন—বঙ্গবাণী
মন্মথনাথ ঘোষ—হেমচন্দ্র
H. M. Das Gupta—Studies in the Influence of English Romantic Poetry on Bengali Poetry.

৭

রবীন্দ্রনাথ যেন বঙ্কিমচন্দ্রের হাত থেকেই জয়মাল্য নিয়ে সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের সাহিত্যসম্রাট্, রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী; ও উপাধি তাঁকে বেশ মানিয়েছিল, কারণ তাঁর ছিল সাহিত্যের সকল বিভাগে আধিপত্য। যেমন কাব্যে, তেমনি গল্পে, উপন্যাসে, শব্দশাস্ত্রে, সাময়িক পত্রের পরিচালনায়, ছন্দে, গানে, সুরে, প্রবন্ধে, ভঙ্গীতে—রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাঁর প্রভুত্ব, সর্ববিষয়ে তাঁর প্রভুত্ব, সর্ববিষয়ে তাঁর মনীষা আমরা টের পাই, শ্রদ্ধানত হয়ে অন্তরের সিংহাসনে তাঁকে স্বীকার করে নিই।

রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় কীর্তি এই যে তিনি আমাদের সবার মনের দরজা দিলেন খুলে। তাঁর আগে বিহারীলাল একাজে হাত দিয়েছিলেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছিল তাঁর কাব্যের প্রাণ। যেমন প্রকৃতিবর্ণনার কাব্যে তিনি আমাদের প্রাচীন বা তাঁর সময়ের কবিদের থেকে একটু স্বতন্ত্র দৃষ্টিভূমির অধিকারী হয়েছিলেন, তেমনি মানুষের মনের ছবি, ব্যক্তির সত্তার ব্যঞ্জনা, ভাবরাজ্যের চিত্র তিনি যে ভাবে ফুটিয়েছিলেন, তার যে ছবি এঁকেছিলেন, তাঁর আগে তো আর বড় একটা কোথাও সে বস্তু পাই না। রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হ'লে আর কারো কবিতা পড়ি না পড়ি, বিহারীলালের কবিতা পড়তেই

হয়। অবশ্য এক হিসাবে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং-সম্পূর্ণ; কিন্তু যেখানে যেখানে সন্ধান করা হয়, কবির উৎস কোথায়, কবি প্রেরণা পেলেন কোথা থেকে, সে সব স্থলে বিহারীলালের কাব্য যথেষ্ট আদৃত হওয়া উচিত। বিহারীলালের দু-একটা ছন্দ, তাঁর ভাবঘন কাব্যচিত্র, তাঁর প্রকৃতিপ্রীতি—বালক রবীন্দ্রনাথের মনে, কিশোর কবির কাব্যপ্রচেষ্টায় যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। কবি তাঁর বিহারীলাল প্রবন্ধে সে বিষয়ে কিছু বলেছেন, আর আমরা যদি তাঁর বাল্মীকিপ্রতিভা পড়ি, তবে তার মধ্যেও শিক্ষানবিশীর ভাব কিছু কিছু দেখতে পাব, বিহারীলালের কাছে তিনি কতটা ঋণী ছিলেন, তার খানিক আভাস পাব।

রবীন্দ্রনাথ মহাকবি, কিন্তু তিনি মহাকাব্য রচনা করেন নাই; এই কথা বললেই তাঁর লোকাতীত মহত্ত্বের কথা ইঙ্গিতে বলা হল। মহাকাব্যের ধরাবাঁধা কোঠায় তাঁর কবিকল্পনা আবদ্ধ থাকতে চাইল না, নির্ঝরিণীর মত পাষাণ বিদীর্ণ করে নিজের পথ সে করে নিল। যে নবযুগের সূচনা হয়তো দুশ বছর আগে হয়ে থাকবে, তাকে তিনি ভাবে ভঙ্গীতে ভাষায় পরিষ্কার ও সুমধুর করে ধরলেন। এখনকার লোকের আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখের কথা, তাঁর কাব্যে সঙ্গীতে কথায় অপরূপ রূপ পেয়েছে, অমর রূপ ধারণ করেছে। "ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ, বাহু বাড়াইব তপনে"—এ হচ্ছে নবযুগে আমাদের মনের নূতন রূপ, আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষার নবরূপ। যে কোনও

লেখকের সম্বন্ধে একথা বলা খাটে যে তাঁর লেখা পড়লে তাঁকে চেনা যাবে, শুধু তাঁর লেখার উপর মন্তব্য পড়লে নয়; রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এ কথা বেশি করেই খাটে। আর এ কথা বলার লোভও হয় এইজন্য যে, তাঁর রচনাবলী শোভনরূপ ধরে আমাদের হাতের কাছে রয়েছে, এখনও দুষ্প্রাপ্য হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে বাংলা দেশের সকলে যে একই ধারণা মনে পোষণ করেন, তা নয়। একাধিক দেশসেবক কর্মীর নিকটে শুনেছি যে রবীন্দ্রনাথের সব চেয়ে ভাল লেখা বেরিয়েছিল তাঁর শেষশয্যায়, পার্লামেন্টের জনৈক মহিলা সদস্যের মন্তব্যের প্রতিবাদে; আর তার পূর্বে একমাত্র চমৎকার লেখা ছিল তাঁর নাইট্‌হুড পরিত্যাগের পত্র। এরূপ মত অবশ্য তেমন বিবেচনার যোগ্য নয়। নাইট্‌হুড পরিত্যাগের পত্র আমাদের জাতীয় ইতিহাসে অবশ্য গৌরবময় স্থান অধিকার করে রয়েছে, তবু যদি সাময়িক লেখার মধ্যেই তারতম্য করতে হয়, যাকে ইংরেজিতে বলে topical—তাহলে জীবনের শেষ বৎসরে বৈশাখমাসে কবি যে আসন্ন ঝটিকার আভাস দিয়েছিলেন, তাঁর সারাজীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর সেই স্বয়ংকৃত সমালোচনা, এ জাতীয় লেখার মধ্যে সবচেয়ে ভাল লাগবার কথা। যে পাঠক বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে তাঁর রচনাবলী পড়বেন তাঁর কাছে কবির বিশেষ শ্রেণীর লেখাই যে ভাল লাগবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? তা হলেও কিন্তু মনে হয়, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম', 'ছোট বড়', 'রাজা প্রজা', 'স্বদেশী সমাজ,'

'ভারতবর্ষ'—এ সমস্ত রচনার আরও বেশি ও আন্তরিক আদর হওয়া উচিত। গ্রামের দিকে যাতে আমাদের চোখ যায়, তার জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করেছেন, থিওরির থেকে নয়, গ্রামকে তিনি যে সত্যই ভালবাসতেন; ভারতের চরণধুলায় আমাদের চিরদারিদ্র্য যে ঘুচে যাবে, সে বিশ্বাস তাঁর ছিল, আর সে বিশ্বাসকে তিনি কর্মে রূপ দিতেও চেয়েছেন। রাজার প্রাসাদে, বিশিষ্টের গণ্ডীতে, পণ্ডিতের মজলিসে, বিশ্বের দরবারে তাঁকে সত্য সত্য খুবই মানিয়েছিল, কিন্তু পদ্মার বাঁকে বাঁকে, গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে, বীরভূমের ডাঙ্গাজমিতে, বাউলের আলাপে তিনি স্বদেশের অমৃতপরশ পেয়েছিলেন, আর সাহিত্যের ও কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে তাকে অক্ষয়রূপ দিয়ে গেছেন।

রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশালতা আমি এ প্রসঙ্গে পরিমাপ করতে যাব না, তা যে নিতান্ত বাতুলতা হবে। আবার একেবারে কিছু না বললেও শোভন হবে না; রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে বলতে গেলে আমার পল্লবগ্রাহিতা একেবারেই অপরিহার্য। যাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে এই আলোচনা পড়ছেন তাঁদের মনেও অনেক কথা সঞ্চিত আছে, তাঁদেরও অনেক কথা বলবার আছে; অগ্রাহ্য করবার আছে, আবার গ্রহণ করবারও আছে। অন্য লেখকের সম্বন্ধে ভাঁওতা দিলে যদি বা-চলে, এখানে চলবে না; বিপদ কম নয়। তবে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে কিছু বললে কেউ উদাসীন থাকবেন না, এইটাই যা সুবিধা।

একটা মূলকথা আমার মনে হয়, বাইরের আড়ম্বরের চেয়ে অন্তরের ঐশ্বর্যের দিকে কবি জোর দিয়েছেন। নাটক, কাহিনী, উপন্যাস, গল্প—যা-ই কেন না তিনি লিখতে গিয়েছেন তার মধ্যেই ভাব দিতে চেয়েছেন ঠেসে পূরে—এই কথা অনেক জায়গায়ই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলতে চেয়েছি, ভাল করে বলতে পারি নাই, যে, তিনি সর্বদা চাইতেন আমরা যেন কোন ছোট কথার গণ্ডীর মধ্যে আটকে না পড়ি। সেই আশংকায় তাঁর সুতো কাটায় আপত্তি, আর সে আপত্তি মহাত্মা গান্ধী ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন বলে খণ্ডন করতে গিয়ে আলোচনা প্রবন্ধে তাঁর নাম দিয়েছিলেন The great sentinel। উপনিষদে তিনি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, প্রাচীন ঋষিদের বাণী তাঁর কণ্ঠে বিরাজ করত—ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। বাইরের ঐশ্বর্য পরিমিত, বাইরের সুখদুঃখ দেশে কালে পরিচ্ছিন্ন, কবিও তাই—তবু তিনি চেষ্টা করেছেন সীমার মাঝে যাতে অসীমের ছায়া তাঁর লেখনীতে ফুটে ওঠে, অন্তরের মঙ্গলমূর্তির আভাস যাতে আমরা তাঁর রচনায় পেতে পারি। কবির ইণ্টারন্যাশনালিজম, মানবিকতা, আন্তর্জাতীয়তা—যে নামই তাকে দিই না কেন, তার প্রসার কাব্যের সর্বত্র। কবি শুধু ভারতের কবি নন, তিনি ভারতেরও কবি, মহাভারতেরও, জগতেরও।

বিশেষ করে তাঁর এ ভাব প্রকাশ পেয়েছে নাটকগুলিতে। রাজা ও রাণীর মত ঘটনামূলক নাটকে নয়, অচলায়তনের মত

নাটকে, ফাল্গুনীর মত রচনায়, তার গানে, রাজা বা অরূপ-রতনের মত রহস্যময়ী মূর্তির মধ্য দিয়ে। এসব নাটকের রঙ্গমঞ্চ ধরণীর মত বিশাল, তার বাতাবরণ জগতের মত প্রশস্ত, মাথায় তার অনন্ত আকাশ, পাত্রপাত্রী তার ব্যক্তি নয়, পরিপ্রেক্ষিতের অনুরূপ উদার ভাব দিয়ে গড়া—মানুষের সৃষ্টি নয়, বিশ্বনাথের সৃষ্টি, মানুষ শুধু তার কবিত্বকল্পনা-ভরা চোখ মেলে তার পানে চেয়েছে। তবু কি ঠাকুর মানুষের চোখে ধরা দেন? পালিয়ে পালিয়ে চলেন তিনি, তাই কবি গেয়েছেন—

যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে,
সে কি আজ দিল ধরা গন্ধে ভরা বসন্তের এই সংগীতে॥
ও কি তার উত্তরীয় অশোক শাখায় উঠল দুলি,
আজি কি পলাশবনে ঐ সে বুলায় রঙের তুলি,
ও কি তার চরণ পড়ে তালে তালে মল্লিকার ঐ ভঙ্গীতে॥
না গো না দেয়নি ধরা, হাসির ভরা দীর্ঘশ্বাসে যায় ভেসে।
মিছে এই হেলা-দোলায় মনকে ভোলায় ঢেউ দিয়ে যায় স্বপ্নে সে॥
সে বুঝি লুকিয়ে আসে বিচ্ছেদেরই রিক্ত রাতে,
নয়নের আড়ালে তার নিত্য জাগার আসন পাতে,
ধেয়ানের বর্ণছটায় ব্যথার রঙে মনকে সে রয় রঙ্গিতে॥

ফাল্গুনীর রচনা হয় বাংলা ১৩২১ সালের ২০ ফাল্গুন; এখন থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে। কিন্তু তার মধ্যে কবি যে যে কথা বলেছেন তা চিরকেলে কথা, চিরকেলে অথচ মামুলি নয়,

প্রতি যুগেই তার দাহ আছে, প্রতিযুগে তার সত্য নূতন করে ফুটে ওঠে। জীবনমৃত্যুর রহস্য, অনন্ত জীবনের রহস্য, ঋতুতে ঋতুতে বিশ্বের ভিতর দিয়ে যে বিচিত্র ছবি ফুটে উঠছে তার রহস্য—কবি বোঝান নি কিছু, বাজিয়েছেন তার সুর, আর সেইখানেই তাঁর যতটা বলার তা বলা হয়ে গিয়েছেন। গানের স্বরূপ অবশ্য ধরা পড়ে সুরের মধ্যে, গাওয়া না হলে—ঠিক সুরে গাওয়া না হলে—তার অর্ধেক তত্ত্বই আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে পড়ে গেল, তবু কথার মধ্য দিয়েও সে পরম তত্ত্বের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়, যখন শুনি—

এই কথাটাই ছিলেম ভুলে—
মিলব আবার সবার সাথে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।
অশোকবনে আমার হিয়া
নূতন পাতায় উঠবে জিয়া,
বুকের মাতন টুটবে বাঁধন
যৌবনেরি কূলে কূলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।

শেলী তাঁর Ode to the west wind-এ যে অনন্ত জীবন, নবীন জীবনের কথা বলেছেন, তার সঙ্গে ফাল্গুনীর সুরের তুলনা করলে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য টের পাওয়া যাবে, যদিও শেলী লিখেছেন একটি কবিতা, আর রবীন্দ্রনাথ

লিখেছেন একটি নাটক। তুলনায় বাংলার কবিপ্রতিভা সেখানে ম্লান হয় নি, ভরসা করে একথা খুবই বলতে পারি।

ঐ একখানা নাটকে কী অফুরন্ত প্রাণের সন্ধানই না পাওয়া যায়! প্রাচীন ধারার কেমন সূক্ষ্ম রেখাই না দেখা যায়! ফাল্গুনীর নবীনজীবনের বারতা, তার আশীর্বাদ, তার উপচে-পড়া আনন্দ, তার প্রকৃতির সঙ্গে সব মিলিয়ে দেওয়া ও দেখা —কিন্তু বিষয়বস্তু? প্লট?—জঁাকাল বিষয়বস্তু বাদ দিয়েও যে রচনার উৎকর্ষ সম্ভব, তা কি আর বলতে বাকি রইল? অরূপরতন হল রাজার অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—তার মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল এই ধরণের স্বাদ; ফাল্গুনীর অভিনয় দেখার সৌভাগ্য যাদের হয় নাই, তাঁরা যদি অরূপরতন দেখতে পেয়ে থাকেন, গান শুনে থাকেন—যখন কবি স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত থেকে অভিনয়কে সজীব করে তুলেছিলেন—তবে আজ প্রায় ত্রিশ বছর হতে চলল, এখনও অরূপ-রতনের সেই অমৃত পরিবেশনের স্পর্শ তাঁরা অনুভব করতে পারবেন—

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো, গান গেয়ে দ্বার খোলাব॥

গান দিয়েই তো কবি পথ দেখিয়েছেন আমাদের—যা রচনা করেছেন, অপূর্ব শব্দসম্ভারে অপরূপ ছন্দ-ঝঙ্কারে তাই যে গীতধর্মী—গানের মত হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে।

আমার সকল নিয়ে বসে আছি
সর্বনাশের আশায়
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে জন ভাসায়।
যে জন দেয় না দেখা যায় গো দেখে,
ভালবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরে
গোপন ভালবাসায়॥

বাইরের রূপ ছাড়বার আগে যে অন্তরের চোখ খোলে না; তাই এমন দিন গেছে যখন তিনি বলেছেন, 'আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার'—যখন তিনি অন্ধ বাউলকে দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছেন—কারণ চোখ তো আমাদের দেখায় না, ভুল দেখায়, আর চোখ না থাকলে আমরা দেখি সকল অঙ্গ দিয়ে, আমাদের দেখা হয় আরও খাঁটি!

রবীন্দ্রনাথ কবি, সুতরাং কাব্যে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্ফুরণ হয়েছিল, সত্য, কিন্তু গদ্যের প্রতিও কবি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কম পড়ে নাই। তিনি গদ্যকে যে অবস্থায় পেয়েছিলেন তার থেকে কত ভাবে কত দিকে তাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন, সে কথা বলা কিছুটা দরকার, নইলে আমাদের নজর সেদিকে নাও পড়তে পারে। কত ধরণের গদ্যই যে তিনি লিখে গেছেন, দেখে অবাক হতে হয়; বিভিন্ন বিষয়ের জন্য, বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের উপযুক্ত করে গদ্য লিখেছেন; সাময়িক পত্রের সম্পাদক হিসাবে যা লিখেছেন, তাও এক অদ্ভুত ধরণের;

তার পরিমাণ ও বৈচিত্র্য বড় কম নয়, কারণ সাধনা ভারতী বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা কোন কালেও কারও পক্ষেও নিতান্ত আয়েশের ব্যাপার ছিল না। আবার গল্পগুচ্ছের ভাষা এ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক; গল্পসপ্তকের ভাষা তো শুধু কথা বলার ভাষা বলে নয়, অন্য দিক দিয়েও আর এক ধরণের। বিভিন্ন উপন্যাসের রচনারীতি এদিক থেকে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নৌকাডুবি, গোরা, ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ, এমন কি তাঁর শেষ উপন্যাস বা দীর্ঘ গল্পেও দেখা যাবে, প্রত্যেকটি উপন্যাসের বিষয়বস্তু যেমন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, গদ্যরচনারও তেমনি নিজস্ব একটা ভঙ্গী আছে। ঘরে বাইরে চতুরঙ্গ, এবং সবুজপত্র এ দুইখানি বই-ই প্রকাশিত হয়েছিল; কিন্তু উভয়েরই ভাষা অনেকটা এক; কিন্তু ব্যঞ্জনায় কি প্রচণ্ড পার্থক্য। নৌকাডুবির যে সূচনা তিনি রবীন্দ্ররচনাবলীর জন্য লিখেছিলেন, তার মধ্যে এ বিষয়ে একটি ইঙ্গিত আছে। ঘটনাজালের দুর্মোচ্যতার জন্য পাঠক লেখককে যদিবা অপরাধী করেন, তা হলেও গল্পের মধ্যে যে অংশে বর্ণনায় এবং বেদনায় কবিত্বের স্পর্শ লেগেছে, সেটাতে যদি রসের অপচয় না ঘটে থাকে, তাহলে সমস্ত নৌকাডুবি থেকে সেই অংশে হয়তো কবির খ্যাতি কিছু কিছু বাঁচিয়ে রাখতে পারে, একথা সংকোচের সঙ্গে কবি পাঠককে জানিয়েছেন, কারণ বলেছেন, 'রুচির দ্রুত পরিবর্তন চলেছে।' রুচির এ পরিবর্তন শুধু পাঠকসমাজে নয়, লেখকের মধ্যেও

চলেছে, এবং সারাজীবন ধরেই চলেছে। দীর্ঘ সাহিত্য-সাধনার বিভিন্ন ক্রমে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন রীতির সৃষ্টি করে গেছেন; নিজেকে তিনি কখনও প্রাণহীন যন্ত্রের মত পানওনি দেখেনও নি, সর্বদাই প্রচুর প্রাণশক্তি তাঁর লেখাকে সঞ্জীবিত করেছে, সবল করেছে; তাঁর 'স্বদেশী সমাজ,' তাঁর 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম,' তাঁর 'সভ্যতার সংকট'—তিনটিই গদ্য প্রবন্ধ, বিষয়ও খানিকটা একরকম, তবু এদের ভাষাগত প্রভেদ যে কত বেশি, সে কথা অভিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। আমাদের জীবনের পটভূমিতে এদের কি স্থান, সে কথা এখানে আলোচ্য না হলেও গদ্য রচনার দিক থেকে তিনটির রীতিগত বৈশিষ্ট্য এখানে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের আর দুটি লেখার উল্লেখ করে তাঁর গদ্য রীতি সম্বন্ধে আলোচনা এখানে শেষ করি—এক হল মহর্ষির শ্রাদ্ধবার্ষিকীতে তাঁর উপাসনা, যেখানে হৃদয়ের আবেগ, উপলক্ষ্যের গাম্ভীর্য, আলোচ্য চরিত্রের শুচিতা, সব অনবদ্য ভাষায় সুসমঞ্জস হয়ে প্রস্ফুট হয়েছে, আর হল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতা 'মানুষের ধর্ম'—দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য সেখানে বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে অবলীলাক্রমে প্রকাশিত হয়েছে, তখনও কিন্তু শিক্ষাবিদ্ পণ্ডিতের শিক্ষার 'মাধ্যম' নিয়ে—অর্থাৎ ইংরাজী আমাদের শিক্ষার মাধ্যম হবে, না, বাংলা—তাই নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা একেবারে থেমে যায় নাই।

আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে বহুস্থানে রবীন্দ্রনাথের পদচিহ্ন

রয়েছে; সাহিত্যের রূপ নিয়ে কত পরীক্ষাই না তিনি করেছেন। তার মধ্যে গদ্যকে নিয়ে দুটো পরীক্ষা বা এক্সপেরিমেণ্টের কথা বলি। চলতি ভাষাকে তিনি যে সাহিত্যের দরবারে অবারিত প্রবেশের অধিকার দিয়েছেন, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছিল; কৌলীন্য নাই বলে তার অপবাদও রটেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে এ ভাষাকে বরণ করে একে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন, সে আসন এখন টলবার নয়। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের এই চলতি গদ্যকে তিনি কবিতারও বাহন করেছেন, এবং সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ধরা পড়ে, ছন্দের এমন একটা গতি এর মধ্যে লক্ষ্য করেছেন। গদ্য কবিতা এখনো আমাদের পণ্ডিত সমাজে অকুণ্ঠিত প্রবেশ লাভ করে নাই, তবু রবীন্দ্রনাথের লেখার পরে তাকে বিনাবাক্যে বিদায় দিতে হলে এখন সাহসের দরকার হয়।

আমার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য মনে হয়, সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্রদৃষ্টি, সম্যক্ দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি। স্রষ্টা ও বিচারক, একজনের মধ্যে দুই রূপ খুব বেশি দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ একা ছিলেন দুই-ই, এবং দুই রূপেই তিনি অপূর্ব। স্রষ্টা হিসাবে তিনি আমাদের দৃষ্টির সামনে রয়েছেন, দ্রষ্টা হিসাবেও কিন্তু রয়েছেন, তবে নজর দিয়ে দেখতে হয় সেটা। দেশী-বিদেশী সাহিত্যের নিপুণ রসবেত্তা আমাদের দেশে আমরা অল্পই পেয়েছি। ঐশ্বর্যময় সংস্কৃত সাহিত্য, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য, ভিক্টোরিয়া যুগ পর্যন্ত ইংরেজি সাহিত্য—শুধু

যে তাঁর নখদর্পণে ছিল তা নয়, তাঁর মতন বোদ্ধা পাঠকের জারকরসে সে সব হয়ে গিয়েছিল জীর্ণ, তারা অন্যরূপ ধারণ করেছিল, এবং সে রূপ ছিল অভিরূপ। তাঁর রচিত প্রাচীন সাহিত্যে ও আধুনিক সাহিত্যে সেই রসবোধের খানিকটা পরিচয় পাই বটে, কিন্তু শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীতে পড়াবার সময়, অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীতে আলাপ করবার সময়, সাময়িক পত্র সম্পাদন কালে—বিশেষ করে যখন সমালোচনা করেছেন তখন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের কথা যখন যখন বলেছেন তখন—আরো অনেক মূল্যবান কথা যে তিনি বলে গেছেন তাতে সন্দেহ নাই, যদিও সে সব কথা এখন ভাল করে জানতে পারার আশা দুরাশা।

কবির জীবিতকালেই অনেকে বলতে আরম্ভ করেছিলেন, রবীন্দ্রযুগ গত হয়েছে; কেউ কেউ রবীন্দ্রোত্তর যুগের সম্বন্ধে আলোচনাও করে থাকেন। এখন তো স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, রবীন্দ্রযুগ আমাদের গত হয় নাই; আমরা এখনও সেই যুগেই আছি। আমাদের মধ্যে যে বিরাট্‌ ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল, যিনি ষাট বৎসরেরও বেশি কাল তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন, তাঁর যুগ এত অল্প কালে শেষ হয়ে যাবে বলে মনে করি না। যাবে বই কি, সর্বহর কালের কাছে সকলকেই চলে যেতে হবে, এবং যাওয়াই তো চাই—মৃত্যু যে জীবনের লক্ষণ। তবু সময় লাগবে, এবং এজন্য অধীর হওয়ার মানে কি আমি বুঝতে পারি না।

বর্তমানকালে বাংলা সাহিত্যে যে সব কৃতী লেখকের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁদের সকলের পরিচয় দেওয়া কি এর মধ্যে সম্ভব? যে ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে এ আলোচনা আরম্ভ করেছি, তাতে সকলের নাম করাও কঠিন। শরৎবাবু প্রায় কুড়ি বৎসরের মধ্যে কথাসাহিত্যে কি ওলট-পালটই না করে গেলেন! এলেন তিনি উল্কাপিণ্ডের মত, এক কথায় বাঙ্গালীর মন জয় করে নিলেন; তাঁর শ্রীকান্ত, তাঁর পল্লী সমাজ, তাঁর চন্দ্রনাথ এঁকে দিল বাঙ্গালী সমাজের গলদ, তার সৌন্দর্য, তার শক্তি—তা হক না সে ভাঙ্গবার শক্তি। "আমার কথাটি ফুরুলো নটে গাছটি মুড়ুলো'—এমনধারা রূপকথা নয়—ধ্বংস, মৃত্যু, সর্বনাশের বর্ণনা, তার মধ্যেও আমাদের ত্যাগ, প্রেম, মায়া-মমতা, কঠোরতা একেবারে সমান হয়ে মিশে পিষে যায় নাই। তাঁর বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় স্থান পেয়েছে, আবার চরিত্রহীন, শেষপ্রশ্ন অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে নিষিদ্ধ ফলের মত কিশোরেরা আস্বাদ করেছে, আর সব্যসাচীর কথা তো আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে মিশেই গেছে; পথের দাবী যে আমাদেরই দাবী। আমাদের মধ্যে যা ছিল দলিত, অবজ্ঞাত, লাঞ্ছিত, শরৎবাবু তার মধ্যে দেখালেন প্রাণশক্তি, দীপ্ত তেজ, সবল মনুষ্যত্ব; আর দেখালেন তিনি সমাজের গণ্ডীর মধ্যে যারা স্থান পায় নাই, তাদের মধ্যেও আছে সাধারণদুর্লভ ব্যক্তিত্ব।

কথাসাহিত্যের ধারা আমাদের পুষ্ট হয়ে চলেছে প্রতিভাবান লেখকের কল্পনায় ; তাঁদের মধ্যে মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা দেখা গেছে, আবার পল্লীজীবনের সৌন্দর্য আঁকবার, প্রকৃতি-লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে আমাদের জন্য যে বিপুল ঐশ্বর্য রয়েছে তার চাবি-কাটি খুলে দেবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। মানুষের মনে, সাধারণ জীবনে, তার ছোটখাট ঘটনার মধ্যে যেভাবে সূক্ষ্ম কারুকার্য রয়ে যায় তারও একটা ছাপ কৃতী লেখকেরা রেখে গেছেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোট গল্প শুধু অবসর বিনোদনের উপায় নয়, তার মধ্যে গল্প বলবার কুশলতা রয়েছে—সাহিত্যের ইতিহাসে তার একটা স্থান রয়েছে। তার পরেও আমাদের কথাসাহিত্য ব্যঞ্জনায়, রসে, নানাদিক দিয়ে অগ্রসর হয়েছে ও হচ্ছে।

শুধু কথাসাহিত্য নয়, আমাদের প্রবন্ধসাহিত্যও বহন করে এনেছে রস ও চিন্তার বিচিত্র সমাবেশ। ভূদেববাবুর সামাজিক ও পারিবারিক প্রবন্ধ জীবনের কর্তব্য বিষয়ে আমাদের সচেতন করে দেয় ; সে লেখার মধ্যে মানবজীবনের অভিজ্ঞতা প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক 'কথা' গুলি রসে পরিপূর্ণ, আবার দৃপ্ত রচনা-রেখায় সমুজ্জ্বল ; জিজ্ঞাসা, কর্মকথা, যজ্ঞকথা জ্ঞানপিপাসু মানুষের জন্য রেখে দিয়েছে রসের ও জ্ঞানের চমৎকার আয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজকের কথা, তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, তাঁর বর্তমান ভারত, প্রবন্ধ সাহিত্যকে

নতুন রচনাশৈলী দিয়ে গেছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুরানো ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলার যে ক্ষমতা ছিল, এ প্রসঙ্গে তাও অবশ্য স্মরণীয়। বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করে ও বাংলাভাষায় শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা দ্বারা, বাংলা গদ্যের পরিধি ভবিষ্যতে বাড়াবার পথ দেখিয়েছেন।

আমাদের মজলিসি সাহিত্যের কেন্দ্র হয়ে হয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। চলতিভাষাকে সাহিত্যের বাহনরূপে প্রধান আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি কম চেষ্টা ক'রেন নাই; আজ যে 'কথ্য' ভাষা এত চলেছে, তার জন্য সবুজ পত্রের অনেকখানি কৃতিত্ব স্বীকার করতে হবে। প্রমথবাবু আমাদের গল্পসাহিত্যকে দীর্ঘকালব্যাপী সাধনায় পরিপুষ্ট করেছেন। তাঁর চার-ইয়ারি-কথা, তাঁর বাণীবাই, তাঁর জুড়ি-দৃশ্য, ঘোষালের ত্রিকথা—বাঙালী পাঠকের চিত্তবিনোদন তো করেছেই, সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু করেছে, বাংলা ভাষার শক্তি বাড়িয়েছে। বাংলা সাহিত্যের দিগ্‌দর্শন, কিংবা রায়তের কথা, কিংবা সংস্কৃত সাহিত্যের পরিচয়, কি প্রাচীন ভূগোল—যে বিষয়েই তিনি আলাপ করুন না কেন, সে আলাপের মধ্যে সার বস্তু থাকবেই থাকবে। তাঁর বলার ও লেখার ভংগী তাঁর একান্ত নিজস্ব।

কথাসাহিত্যে একজন অসামান্য শিল্পীকে আমরা হারিয়েছি। পথের পাঁচালীর কত যে প্রয়োজন ছিল তা আমরা আজ বুঝতে পেরেছি। বিভূতিভূষণ আমাদের

উপন্যাসের মধ্যে ছোট গল্পের মধ্যে মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, বাঙ্গালীর তা পরম সম্পদ্।

বাংলা সাহিত্যের সেবকেরা নানাস্থানে নানাভাবে সাহিত্য-চর্চা করে চলেছেন। বিশেষ করে কারও পরিচয় দেওয়া এই আলোচনার মধ্যে সম্ভব নয়; জীবিত লেখকদের সম্বন্ধে মন্তব্য করা বোধ হয় রীতিও নয়। বর্তমানকালের সাহিত্যে নব নব পথ উদ্ভাবন, নবীন দৃষ্টিভংগীর পরিচয় পেতে হলে মনে পড়ে কতকগুলি গোষ্ঠীর কথা। তার মধ্যে কয়েকটি আবার গোষ্ঠীগত ঐক্যের দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত। এ সম্পর্কে কল্লোলের উল্লেখ অবশ্য করণীয়। কল্লোলের প্রকাশ একটা নতুন সুরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। মনে হয়, যখন বর্তমান যুগের সাহিত্য বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা সম্ভব হবে, অতি-আধুনিক যখন ইতিহাসের পর্যায়ে পড়ে যাবে, তখন কল্লোলের ঐতিহাসিক মূল্য আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে; নবযুগের উন্মেষ কল্লোল করেছিল, এ দাবী অগ্রাহ্য হবে না। এখনও তার সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে আমাদের পাঠকরা আগ্রহশীল।

সাহিত্যসাধনা একদিকে যেমন পরস্পরকে কাছে টানে, তেমনি আবার ব্যক্তিত্বের বিকাশদ্বারা মানুষকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করেও দেয়; বিভিন্ন সাহিত্যগোষ্ঠী কল্যাণের পথে কতখানি সহযোগিতা করবে, সে কথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাই কোনও কথা বলা

বড় বিপদ—বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যতের সঙ্গে যে তার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যদি বাঙ্গালী বড় হয়, তবে তার সাহিত্যও বড় হবে বলে আশা করা যায়। তাই বলে মহামানবদের সম্বন্ধে কিছু বলাও চলে না। ভিক্টোরিয়ার যুগেও ইংরেজি-সাহিত্য শেক্‌সপীয়রের অভ্রভেদী গৌরবের কাছে যেতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের মত কবি বাংলায় নিকট ভবিষ্যতে হতে পারেন, এ আশা দুরাশা। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রাণহীন অনুকরণের চেয়ে অপটু কবিরও আপনার ভাবে বলা বহুগুণে কাম্য। তবু সাহিত্যচর্চা আমাদের দেশে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে। গত একশ বছরে আমরা যে সম্পদ পেয়েছি, জাতির মধ্যে তা যেন ছড়িয়ে পড়তে পারে—সাহিত্য পরিবেশনের ও উপভোগের ক্ষমতা বেড়ে আমাদের সরসতা যেন সমাজের স্তরে স্তরে সংক্রামিত হয়।

মহিলা সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে পৃথক করে কিছু বলি নাই, তাঁদের স্বতন্ত্র কোঠায় ফেলে আলোচনা করতে চাই নাই বলে। আজ কাব্যসাহিত্যে ও কথাসাহিত্যে, এমন কি দর্শন সাহিত্যেও তাঁরা নিজেদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক—সাহিত্যরচনায় শ্রেষ্ঠত্বসূচক পুরস্কার—মহিলা সাহিত্যিকেরাও পেয়েছেন। সুতরাং তাঁদের যোগ্যতার কথা ওঠে না;—এই প্রসঙ্গের ভিতর স্বতন্ত্রভাবে খুব অল্প সাহিত্যিকেরই নাম করা সম্ভব হয়েছে।

আমাদের সাহিত্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায়,

কিংবা পাশ্চাত্য প্রধান প্রধান সাহিত্যের তুলনায় কোথায় দাঁড়িয়ে, সে কথা জানতে অব˝ ইচ্ছা করে। হিন্দী সাহিত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা, তা থেকে আমাদের শিখবার আছে অনেক। বাংলায় যত জন বই কেনে, তার চেয়ে অনেক বেশি লোক হিন্দী ভাষায় লেখা বই কেনে। হিন্দী ভাষার পুস্তকের যত উৎসাহী প্রকাশক পাওয়া যায়, বাংলায় তত পাওয়া যায় না। গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস ধর্মসাহিত্য প্রচারের জন্য যতখানি কাজ করেছে, করতে পেরেছে, তা আমাদের বিশেষ যত্নের সঙ্গে লক্ষ্য করা উচিত; গীতা, ভাগবত ইত্যাদি বইয়ের কাটতি যেমন বেশি, দামও তেমন সস্তা, ছাপা কাগজ ইত্যাদিও তেমনই পছন্দসই। মারাঠি ও গুজরাতী সাহিত্যে দার্শনিক ও অনুবাদ ভাগ যথাক্রমে এ বিষয়ে অগ্রণী। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দু ভাষা শিক্ষার বাহন বলে গৃহীত হওয়ায় উর্দু ভাষার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়েছে, ইতিমধ্যে সে ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের পরিচয় নেওয়াও আমাদের উচিত। মোটকথা, কূপমণ্ডুকের অহংকারে নিশ্চিন্ত হয়ে যেন আমরা না থাকি; আমাদের মধ্যে যাঁরা রচনায় সিদ্ধহস্ত, বাংলা সাহিত্যের গৌরব বাড়াবার জন্য তাঁদের চেষ্টা ও সাধনা অন্য প্রদেশের লোকের তুলনায় অগ্রসর হলে ভাল হয়।

যে মুহূর্তে আমাদের আধুনিক বৈশিষ্ট্য দেখে আমরা গর্ব অনুভব করি, সেই মুহূর্তে যেন মনে করি আধুনিক ইউরোপীয়

সাহিত্যের উৎকর্ষের কথা—শুধু কথাসাহিত্য বা কাব্য-সাহিত্যে নয়; জগতে সেখানে যে বিষয়ে কোন গ্রন্থ প্রকাশিত বা কোন তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে, অমনই ইংরেজি ভাষায় বেরিয়েছে তার অনুবাদ; অন্য দুইটি প্রধান ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে একটির বিশদ ও প্রাঞ্জল রীতির কথা সকলে জানেন—ফরাসি ভাষার অতি সাধারণ লেখকের লেখাতেও এই রীতি স্পষ্ট দেখা দিয়েছে; অন্যটির উৎকর্ষ হল, ভাষার বৈজ্ঞানিক চিন্তার বা বক্তব্য বিষয় একেবারে ঠিক ঠিক ভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা। যেখানে মাসে মাসে এক একখানি বইয়ের এক বা একাধিক সংস্করণ হওয়ার কথা শুনি, সেখানে আমরা, যাদের অধিকাংশ বই-ই দ্বিতীয় সংস্করণের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় না, তাদের তুলনায় আমরা কোথায়? এ প্রশ্ন অবশ্য সরল নয়, শুধু উৎকৃষ্ট রচনার কথা নয়, তবু সে কথাও এর মধ্যে আছে, নিজের দেশের সাহিত্য প্রচারে গৌরববোধ ও সে চেষ্টার ঔচিত্যবোধের কথাও আছে।

ইচ্ছা করে, আমাদের বাংলা সাহিত্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অন্যান্য সাহিত্যের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে মিশুক; তাদের অতীত, বর্তমান ও অনাগত সাহিত্যিক প্রচেষ্টা যেন আমাদের অনুভূতির ও পরিচয়ের বাইরে না যায়; ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে স্যর আশুতোষ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা যেন সফল হয়। সত্য, শিব ও সুন্দরের যে আদর্শ, সাময়িক উত্তেজনার বশে আমরা যেন তা হতে বিচ্যুত না হই; একদিকে

বিশ্বের সাহিত্য হতে গ্রহণ করতে পারি, অন্যদিকে আমাদের সাহিত্যও যেন জগতের বিভিন্ন অংশে যথোচিত প্রসার ও মর্যাদা লাভ করতে পারে। বাঙ্গালীর গড়বার ক্ষমতা, তার কলাকৌশল, তার মনীষা, তার সাহিত্য ও বিচারশক্তিকে আরও বিকশিত করুক ; জাতির তথা বিশ্বের পরম কল্যাণে সুন্দরেব ধ্যানে ও নিরূপণে নিরত থেকে, বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গের সাহিত্যিক সবল আত্মপ্রসাদ লাভ করুক।

পঠনীয় :

অজিত চক্রবর্ত্তী—কাব্যপরিক্রমা
সুবোধচন্দ্র সেন গুপ্ত—রবীন্দ্রনাথ
প্রথমনাথ বিশী—রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ
হুমায়ূন কবির—Sarat Chandra Chatterjee
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—কল্লোল-যুগ।

গ্রন্থ-পঞ্জী

[বিস্তারিত আলোচনার জন্য]

রামগতি ন্যায়রত্ন—বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব

দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

প্রিয়রঞ্জন সেন—সাহিত্যপ্রসঙ্গ

শশাঙ্কমোহন সেন—বাণী মন্দির

সতীশচন্দ্র রায়—পদকল্পতরু

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

মনোমোহন ঘোষ—বাংলা গদ্যের চারযুগ

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—নাট্যশালার ইতিহাস

শশীভূষণ দাসগুপ্ত—বাংলা সাহিত্যের নবযুগ

S. K. De—Bengali Literature in the 19th Century

B. N. Seal—New Essays in Criticism

P. R. Sen—Western Influence in Bengali Literature
